নবীন বিজ্ঞানী

ত্রৈমাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রকাশকাল ঃ জুন, ২০১৫

- পুষ্টিকর খাদ্য মাশরুম
- উপকূলীয় সমস্যা
- মহাকর্ষের কড়চা
- সূর্যের কথা

নবীন বিজ্ঞানী

ত্রৈমাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা

৩৬তম কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান মেলা সংখ্যা
প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১৫

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী :
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
কিউরেটর (সার্বিক)
জনাব মো: মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর
জনাব আফছানা শারমিন
সহকারী কিউরেটর
জনাব শ্যামল বসাক
সিনিয়র আর্টিস্ট
জনাব পপি মণ্ডল
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

প্রচ্ছদ :
জনাব শ্যামল বসাক

সহযোগিতায় :
জনাব মো: কামরুল ইসলাম

অঙ্গ সজ্জা :
জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল : infonmst@gmail.com

সূচীপত্র

			পৃষ্ঠা
► সূর্যের কথা	:	ড. কালিপদ কুণ্ডু	– ১
► পুষ্টিকর খাদ্য-মাশরুম	:	ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূইয়া	– ৫
► আপেক্ষিক তত্ত্বের শতবার্ষিকী	:	জহুরুল হক বুলবুল	– ৯
► উপকূলীয় সমস্যা	:	ড. আকন্দ সামসুন নাহার	– ১৫
► মহাকর্ষের কড়চা	:	সৌমেন সাহা	– ১৯
► কৃষি ও তথ্য বিপ্লব	:	শহিদুল ইসলাম	– ২৬
► পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ঃ টেকসই উন্নয়নের নিয়ামক	:	মো: সিরাজুল ইসলাম	– ২৮
► আজব দূরবীক্ষণের মজার ইতিহাস	:	তানহা ওয়াহিদ আদৃতা	– ৩২
► ইন্টারনেটে বিশ্ব যোগাযোগের সেতুবন্ধন	:	নুরুন নাহার কবিতা	– ৩৩
► স্যার আইজ্যাক নিউটন ঃ মহাকর্ষ বল সূত্রের উদ্ভাবক	:	মো: নাসিম	– ৩৬
► জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	:	মো: মিজানুর রহমান	– ৩৯
► ৩৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা	:	–	– ৪১

মহাপরিচালক

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দু'হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সে সব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়
- প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে

সম্পাদক
"নবীন বিজ্ঞানী"
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২০৮৪
ই-মেইল ঃ infonmst@gmail.com

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকা বিস্তারিত জানতে হলে উপরোক্ত ঠিকানা, সম্পাদক-এর নামে যোগাযোগ করুন

মুখবন্ধ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল নানাবিধ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং তরুণ প্রজন্মের বিজ্ঞান বিষয়ের উদ্ভাবনকে সংরক্ষণ এবং ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর 'নবীন বিজ্ঞানী' নামে ত্রৈমাসিক একটি সাময়িকী প্রকাশের কার্যক্রম গ্রহণ করে। তবে দুঃর্ভাগ্যবশত কিছু প্রতিকূলতার কারণে বিগত জুন, ২০১৩ এর পর দীর্ঘদিন যাবৎ সাময়িকীটির প্রকাশ কার্যক্রম স্থগিত ছিল। ৩৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ কেন্দ্রীয়ভাবে পালন উপলক্ষে সাময়িকীটি আবার নতুনভাবে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

আধুনিক যুগের অগ্রগতির মূল হাতিয়ার হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। "নবীন বিজ্ঞানী" প্রকাশনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সেই সুনির্মল ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। "নবীন বিজ্ঞানী" এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান জগতের বিচিত্র ও বাস্তবসম্মত বিষয়সমূহ সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় ভাষায় জ্ঞানপিপাসু মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা এবং বিজ্ঞান চর্চায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক, জাগতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ ও গতিশীল হবে। প্রকাশনা একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। যদিও বাংলাদেশে এ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকাশনার সংখ্যা খুবই কম। সমৃদ্ধ বিশ্ব বিনির্মাণে উন্নত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার নিয়ে আমাদেরকেও বিশ্ব দরবারে আসীন হতে হবে বিজ্ঞানের নানা অজানা আবিষ্কারের তথ্য ও জ্ঞান সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকাশনা। "নবীন বিজ্ঞানী" সাময়িকী দীর্ঘদিন যাবৎ বিজ্ঞান পিপাসু মানুষের চাহিদা হয়ত স্বল্প মাত্রায় মিটিয়ে আসছে। এ ধরনের প্রকাশনা একদিকে যেমন নবীনদের মধ্যে নতুন আবিষ্কারের নেশা ছড়িয়ে দিবে অন্যদিকে প্রবীণদের মাঝেও ছড়িয়ে দিবে জ্ঞানের আলো। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দেশের কিশোর-তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে এবং তাদের সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনার প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে এ "নবীন বিজ্ঞানী" সাময়িকীটি ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশ করে থাকে। এ সাময়িকীর নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে দেশের তরুণ উদ্ভাবকদের আগামী দিনের সময়োপযোগী উদ্ভাবনীসমূহের প্রকাশের এবং প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। "নবীন বিজ্ঞানী"র নিয়মিত প্রকাশ বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি। এ প্রকাশনা কার্যক্রমে নিয়োজিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
ঢাকা

সূর্যের কথা

আঁধার রাতে নির্মেঘ আকাশে ঝিকিমিকি করে অসংখ্য তারা – জ্বলে আর নেভে। কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি নিষ্প্রভ। খালি চোখে দেখা যায় আনুমানিক ২,৫০০টি, শক্তিশালী টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে দেখলে এ সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। দিনের আকাশেও তারা থাকে, কিন্তু কেবল একটি তারাই আমরা দিনের বেলা দেখতে পাই; এটিই আমাদের চির পরিচিত তারা সূর্য যা আমাদের সবচেয়ে কাছে রয়েছে। অন্য তারাগুলোর তুলনায় খুব কাছে থেকে সূর্য অতি উজ্জ্বল আলো দেয়; অনেক দূরের তারাগুলোর জোনাকির মত ক্ষুদ্র আলো সূর্যের প্রখর আলোয় নিষ্প্রভ হয়ে যায়। সেজন্য দিনের বেলায় আমরা তাদের দেখতে পাই না। সূর্য রয়েছে পৃথিবী থেকে ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে। আমাদের জন্য এ দূরত্বই সঠিক হয়েছে। আরো কাছে থাকলে সূর্যের তীব্র উত্তাপে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম, যদি আরো দূরে থাকত তাহলে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যেতাম; পৃথিবীতে জীবন বলে কোন কিছু থাকত না।

সূর্য এবং আকাশের যে তারাগুলো আমরা দেখতে পাই তারা সবাই একটি ছায়াপথে (Galaxy) রয়েছে, এর ইংরেজী নাম The Milky Way, বাংলায় আমরা একে 'আকাশগঙ্গা' বলি। রাতের আকাশের দিকে তাকালে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আবছা আলোর একটি মেঘ দেখা যায় যার মধ্যে আনুমানিক ১০ হাজার কোটি তারা থাকে। এটিই আমাদের ছায়াপথ 'আকাশগঙ্গা'। আকাশ গঙ্গায় উপস্থিত সকল তারার তুলনায় সূর্য একটি অতি সাধারণ তারা, খুব বড়ও নয়, খুব ছোটও নয়; উত্তাপ ও উজ্জ্বলতার দিক দিয়েও এটি অন্য তারাগুলোর মতই। মহাকাশে আকাশগঙ্গার মত আরো কোটি কোটি ছায়াপথ রয়েছে। ফলে মহাবিশ্বে সূর্যের অবস্থান একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মত তাৎপর্যহীন। কিন্তু আমাদের কাছে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারা, একে নিয়েই গঠিত হয়েছে সৌরজগৎ, পৃথিবী এ সৌর জগতেরই একটি গ্রহ।

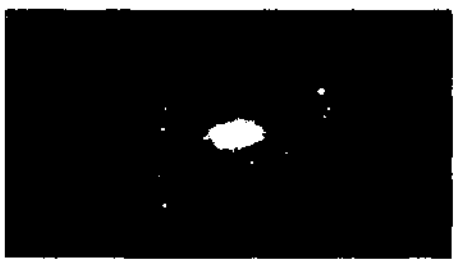

আকাশগঙ্গার আলোকচিত্র

আকাশগঙ্গা একটি পেঁচানো (Spiral) ছায়াপথ। এর কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ৩২,০০০ আলোক বর্ষ (১ আলোক বর্ষ ৯৪০ হাজার কোটি কিলোমিটার) দূরে সূর্যের অবস্থান। গোধূলির আকাশে আমরা সূর্যকে দেখি, সবাই দেখি সূর্যের চেহারা একটি গোলকের মত। এটি কত বড় তা [illegible] ব্যাস বরাবর ১০৯টি পৃথিবী অনায়াসে পাশাপাশি সূর্যের মধ্যে ঢুকে থাকতে পারে। পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭০০ কিলোমিটার, সূর্যের ব্যাস ১৪,০০,০০০ কিলোমিটার। ওজন হিসাব করলে দেখা যায় একটি সূর্যের ওজন ৩,৩০,০০০টি পৃথিবীর ওজনের সমান। সৌর জগতের মোট ওজনের ৯৯.৯% হলো সূর্যের একার ওজন যার প্রকৃত মান ৪.৫ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন টন। পৃথিবী থেকে সূর্য যে দূরত্বে রয়েছে তার মধ্যে একই মাপের ২১৪টি সূর্য পাশাপাশি থাকতে পারে।

সূর্যই সৌরজগতের সকল শক্তির একমাত্র উৎস। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে না পৌঁছলে আমাদের পৃথিবী একটি অন্ধকারে ঢাকা অতি শীতল বৃহৎ পাথরের পিণ্ড হয়ে থাকত, জীবন বলে কোন কিছু এখানে থাকতে পারতো না।

সূর্যের কেন্দ্রস্থল একটি বিশালাকার নিউক্লীয় চুল্লীর (Nuclear reactor) মত। সেখানে তাপমাত্রার মান আনুমানিক ১৫ মিলিয়ন (১ কোটি ৫০ লক্ষ) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বাইরের দিকে এ তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে কমতে পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা হয়েছে ৬০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। অন্য তারাগুলোর মত সূর্য ও হাইড্রোজেন এবং

সামান্য পরিমাণ হিলিয়াম গ্যাস মিশ্রণের একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। কেন্দ্রস্থলের তীব্র উত্তাপে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো দূরন্ত গতিতে ছুটাছুটি করে নিজেদের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ ঘটায় যার ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ফিউশন (Fusion) ঘটে এবং একটি চেইন বিক্রিয়ার (chain reaction) মাধ্যমে হিলিয়াম গঠিত হয়। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস এক সাথে মিশে গিয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস এবং দুটি পজিট্রন উৎপন্ন করে। এটি এক ধরনের নিউক্লীয় বিক্রিয়া। এ বিক্রিয়ায় পদার্থের কিছু অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং গামা রশ্মি (γ-rays) হিসেবে বিপুল শক্তি নিঃসৃত হয়। সূর্যের কেন্দ্রস্থল থেকে নিঃসৃত এ শক্তি ক্রমশ গামা রশ্মি ⟶ রঞ্জন রশ্মি ⟶ আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ⟶ আলোক শক্তি রূপে পরিবর্তিত হয়ে সূর্য থেকে বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্রিয়াই হলো সূর্য এবং সকল তারা আলো ও তাপশক্তির উৎস। আলো শোষণ করেই সব পদার্থ উত্তপ্ত হয়। নিচে একটি চেইন বিক্রিয়া কৌশলে হাইড্রোজেন পরমাণুর হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তর এবং শক্তি নিঃসরণ দেখানো হয়েছে

$$ {}_1^1H + {}_1^1H \rightarrow {}_1^2H + {}_{+1}e^0 + \gamma $$
$$ {}_1^2H + {}_1^1H \rightarrow {}_2^3He + \gamma $$
$$ {}_2^3He + {}_1^1H \rightarrow {}_2^4He + {}_{+1}e^0 + \gamma $$
$$ {}_2^3He + {}_1^2H \rightarrow {}_2^4He + {}_1^1H + \gamma $$
$$ {}_2^3He + {}_2^3He \rightarrow {}_2^4He + 2\,{}_1^1H + \gamma $$
$$ {}_1^2H + {}_1^2H \rightarrow {}_2^3H + {}_1^1H + \gamma $$
$$ {}_1^3H + {}_1^1H \rightarrow {}_2^4He + \gamma $$
$$ {}_1^3H + {}_1^2H \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n + \gamma $$

এভাবে বিভিন্ন পথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি হিলিয়াম পরমাণু এবং দুটি পজিট্রন গঠিত হয়। সূর্যের কেন্দ্রস্থল যেখানে তাপমাত্রা ১ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকেও বেশি সেখানে তিনটি হিলিয়াম পরমাণুর ফিউশন (Fusion) বিক্রিয়া থেকে একটি কার্বন ১২ আইসোটোপও গঠিত হতে পারে। এটি একটি প্রভাবক উপস্থিত থেকে হাইড্রোজেন ফিউশন বিক্রিয়া থেকে হিলিয়াম গঠনে সহায়ক হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে কার্বন চক্র বলা হয়।

কার্বন-১২ আইসোটোপ গঠনের বিক্রিয়া ঃ $ {}_2^4He + {}_2^4He \rightarrow {}_4^8Be + \gamma $

$$ {}_4^8Be + {}_2^4He \rightarrow {}_6^{12}C + \gamma $$
$$ 3\,{}_2^4He \rightarrow {}_6^{12}C + Energy $$

কার্বন চক্র :

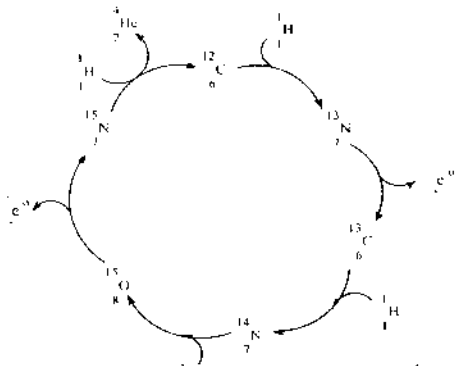

মোট বিক্রিয়া ঃ $ 4\,{}_1^1H \rightarrow {}_2^4He + 2\,{}_{+1}e^0 $

হাইড্রোজেন পরমাণুর চেইন বিক্রিয়া (chain reaction) এবং কার্বন চক্র উভয় কৌশলেই চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ফিউশন থেকে একটি হিলিয়াম পরমাণু এবং দুটি পজিট্রন সৃষ্টি হয়। এজন্য সূর্যের কেন্দ্রস্থলে হিলিয়াম ও পজিট্রনের প্রাচুর্য বাইরের দিকের তুলনায় অনেক বেশি থাকে।

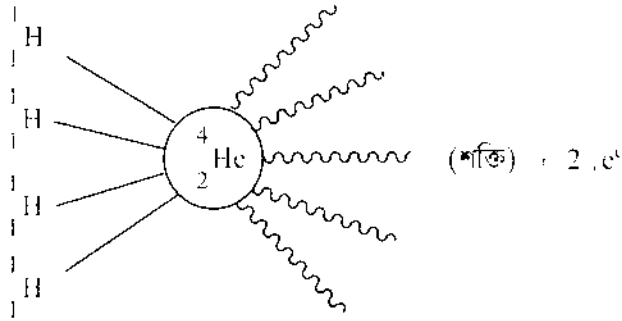

হাইড্রোজেন পরমাণুর ফিউশন থেকে হিলিয়াম গঠিত হলে কিছু ভর কমে যায়। কমে যাওয়া এ ভরটুকুই আইনস্টাইনের বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্ব $E=mc^2$ [m=ভর, c=আলোর বেগ, E=ভরের তুল্যশক্তি] অনুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আলোরূপে সূর্য থেকে বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আলো বিকিরণ করে সূর্যের ভর ক্রমশ কমে যায়। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠিত হলে ভরের ঘাটতি এবং সূর্য থেকে নিঃসৃত শক্তির পরিমাণ নিচে হিসাব করে দেখানো হয়েছে।

$$4\,{}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + 2\,{}_{+1}e^{0} + E$$

${}^{1}_{1}H$ এর ভর = 1.007825 a.m.u

${}^{4}_{2}He$ এর ভর = 4.00260 a.m.u

${}_{+1}e^{0}$ এর ভর = 0.000548 a.m.u

ফিউশন বিক্রিয়ায় ভরের ঘাটতি,

Δm = [4টি ${}^{1}_{1}H$ পরমাণুর ভর - (1টি ${}^{4}_{2}He$ পরমাণুর ভর + 2টি ${}_{+1}e^{0}$ এর ভর)]

$$= [4 \times 1.007825 - (4.00260 + 2 \times 0.000548)] \text{ a.m.u}$$
$$= 4.0313 - (4.00260 + 0.001096)$$
$$= 4.0313 - 4.003696$$
$$= 0.0276 \text{ a.m.u}$$

এই ঘাটতি ভরটুকুই (Δm) শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সূর্য থেকে নিঃসৃত হয়। এ শক্তির মান

$$E = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV } [1 \text{ a.m.u} = 931.5 \text{ MeV}]$$
$$= 0.0276 \times 931.5 = 26 \text{ MeV}$$

প্রতি সেকেন্ডে সূর্যের কেন্দ্রস্থলে ৭০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন ফিউশন বিক্রিয়া থেকে হিলিয়াম গঠিত হয়ে চলেছে এবং এর ফলে সূর্য প্রতি সেকেন্ডে ৪ (চার) মিলিয়ন টন ওজন হারাচ্ছে। আমাদের কাছে এ ওজন অনেক বেশি মনে হলেও সূর্যের বিশাল ওজনের তুলনায় এ ওজন খুবই নগণ্য। তথাপি সৃষ্টির পর সূর্যের যে ওজন ছিল এর বর্তমান ওজন সে তুলনায় খানিকটা কম। শক্তি বিকিরণের জন্য একমাত্র

হাইড্রোজেনই সূর্যের জ্বালানি। অনন্তকালের জন্য এ জ্বালানির সরবরাহ টিকে থাকতে পারে না, সুদূর মহাকালের কোন একদিন অবশ্যই এ জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে আমাদের শঙ্কিত হবার কিছু নেই। আনুমানিক ৫ মিলিয়ন (৫ লক্ষ কোটি) বছর আগে সূর্যের জন্ম হয়েছিল এত দীর্ঘকালেও জ্বালানির খরচ হয়েছে মাত্র ১% এর কাছাকাছির মত।

সূর্য থেকে নিঃসৃত শক্তিকে আমরা আলো এবং তাপ হিসেবে পাই। এর জন্য আমাদের অর্থ খরচ করতে হয় না। সৌর কোষ (Solar cells) ব্যবহার করে আমরা সৌর শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি। সূর্যের দিকে তাকানো খুবই বিপদজনক। বাইনোকুলার (Binoculars) এবং টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালে মুহূর্তের মধ্যে আমরা অন্ধ হয়ে যাব।

সূর্যে হাইড্রোজেনের মজুদ যতই হোক না কেন অবিরামভাবে নিউকিয়ার বিক্রিয়া করে আলো বিকিরণ করতে করতে একদিন তা শেষ হতেই হবে। তখন কি হবে? সৌর জগৎ তখন কোথা থেকে শক্তি পাবে? পরম শূন্য তাপমাত্রায় গহীন অন্ধকারে ডুবে যাবে সব কিছু। হয়ত তাই। কিন্তু সূর্যের উত্তাপ সৃষ্টির আর কোন উপায় কি থাকতে পারে না? আমরা আশাবদী। আমরা ভাবতে চাই, সব হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে সূর্যে থাকবে হিলিয়াম গ্যাস। নিউক্লিয় বিক্রিয়া করা হাইড্রোজেনের একক অধিকার হবে কেন? চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস থেকে যেমন একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয়ে শক্তি নিঃসৃত হতে পারে, হিলিয়াম নিউক্লিয়াসগুলোও তেমনি নিজেদের মধ্যে ফিউশন বিক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন নিউক্লিয়াস ও প্রচুর শক্তি উৎপাদন করতে পারবে। ফলে সূর্যের তাপ ও আলো বিকিরণের ক্ষমতা কোন দিন শেষ হবে না। তার কাছে আলো আর উত্তাপ পেয়ে আমাদের পৃথিবী থাকবে চির নবীনা।

$$4\,{}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + 2\,{}_{+}e^{o} + \gamma$$
$${}^{4}_{2}He + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{8}_{4}Be + \gamma$$
$${}^{4}_{2}He + {}^{8}_{4}Be \rightarrow {}^{12}_{6}C + \gamma$$
$${}^{12}_{6}C + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{15}_{7}N + {}^{1}_{1}H + \gamma$$
$${}^{15}_{7}N + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{16}_{8}O + \gamma$$

References :

1. Bang! The Complete History of the Universe, Brian May, Patrick Moore and Chris Lintott Carlton Books, 2006, London.

2. Universe: The Definitive Visual Guide, Editors: J. Chrisholm, B. Hoare, J. Simmonds, G. Sparrow and N. Twyman, Dorling Kindersley, 2005, London.

3. Essays About the Universe, B. A. Vorontsov-Vel'yaminov, Mir Publishers, Moscow, 1985

4. Discovering the Universe, Charles E. Long, Harper & Row Publishers, New York, 1980

5. The Universe, I. Asimov, Walker, New York, 1971.

6. The Sun, T. Furniss, Wayland Publishers Ltd., U.K. 1999.

7. Big Bang, H. Couper and N. Henbest, Dorling Kindersley, London.

ড. কালিপদ কুণ্ডু
প্রফেসর
রসায়ন বিভাগ
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

পুষ্টিকর খাদ্য-মাশরুম

পুষ্টিকর খাদ্যের কথা ভাবতে গেলে মাশরুমের কথা উল্লেখ না করে উপায় নেই। মাশরুম একটি প্রোটিনসমৃদ্ধ অতি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর সবজি। এতে দেহের অত্যাবশ্যকীয় সবরকম এমিনো এসিড প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কম ক্যালরি ও নাম মাত্র চর্বিযুক্ত পর্যাপ্ত ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য ও আঁশসহ মাশরুম একটি প্রোটিনসমৃদ্ধ সবজি। পুষ্টির কারণে মাশরুমের স্থান সবজির জগতে সর্বোচ্চ স্থানে। সারা বিশ্বে নিরাপদ ও পুষ্টিকর সবজি হিসেবে মাশরুমের চাহিদা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশে অল্প পরিমাণে হলেও মাশরুমের আবাদ শুরু হয়েছে। দেশের অভিজাত বিতানগুলোতে তাজা, শুকনো এবং গুড়ো তিন রকম মাশরুমই পাওয়া যায়।

মাশরুম এক প্রকার ছত্রাক। মূল, কাণ্ড ও পাতাবিহীন এক প্রকার অসবুজ উদ্ভিদ। এদের দেহে কোন পরিবহনতন্ত্র নেই। এদের দেহে কোন ক্লোরোফিল সৃষ্টি হয় না বলে এগুলো অসবুজ হয় এবং খাদ্যের জন্য অন্যান্য উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ বস্তুর উপর নির্ভরশীল। প্রজাতি ভেদে এদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হয়ে থাকে। যেমন-সাদা, হলুদ, কমলা, কালো বা গাঢ় বাদামি। প্রজাতি ভেদে নানা রকম মাশরুম মানুষ আবাদ করে। এদের মধ্যে রয়েছে ঝিনুক মাশরুম, খড় মাশরুম, শিতাকে মাশরুম, দুধ-সাদা মাশরুম, ঋষি মাশরুম এবং বাটন মাশরুম। আমাদের দেশে ঝিনুক মাশরুম, শিতাকে মাশরুম এবং বাটন মাশরুম জন্মানো হয়ে থাকে।

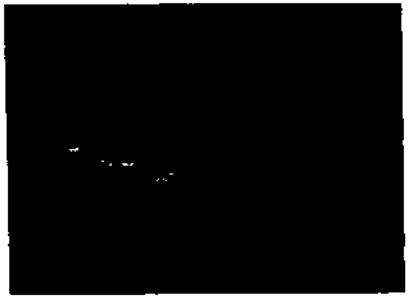

চিত্র-১ ঃ ঝিনুক মাশরুম

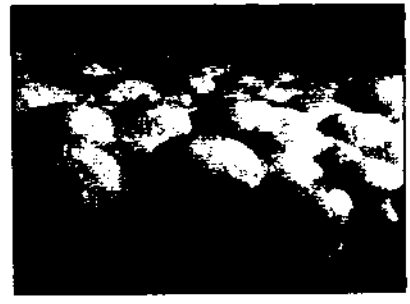

চিত্র-২ ঃ বাটন মাশরুম

আগেই বলেছি মাশরুম একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি। মাশরুমে প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যকীয় এমিনো এসিড এফএও-এর নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে খানিকটা বেশিই রয়েছে। অন্যান্য উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ এমিনো এসিড-লাইসিন ও ট্রিপ্টোফ্যান অনুপস্থিত থাকে বলে এদের নিম্নমানের প্রোটিন বলা হয়। মাশরুমে প্রতিটি এমিনো এসিড বিদ্যমান থাকায় এরা মাছ-মাংস-ডিম-দুধের সমমানের। মজার ব্যাপার হলো মাছ-মাংস-ডিম-দুধের তুলনায় এদের চর্বির পরিমাণ অত্যন্ত কম। শুষ্ক ওজনে মাশরুমে অশোধিত চর্বির পরিমাণ মাত্র শতকরা ২-৮ ভাগ। মাশরুমে প্রাপ্ত ফ্যাটি এসিডের মধ্যে শতকরা ৭২ ভাগ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। প্রজাতি ভেদে মাশরুমে দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড লিনোলেয়িক এসিড রয়েছে শতকরা ৭০-৭৬ ভাগ। এ কারণেই স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের জন্য এটি একটি আদর্শ খাবার

মাশরুম অনেকগুলো ভিটামিনের উত্তম উৎস। এদের ভিটামিন B কমপ্লেক্স গ্রুপের ভিটামিন ভালই রয়েছে। বিশেষ করে মাশরুমে থায়ামিন (B_1), রিবোফ্ল্যাভিন (B_2) এবং বায়োটিন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সবচেয়ে ভাল খবর হলো এই যে, অধিকাংশ উদ্ভিজ্জ খাদ্যে ফলিক এসিড এবং ভিটামিন B_{12} অনুপস্থিত থাকলেও মাশরুমে এদের পরিমাণ যথেষ্ট রয়েছে। অন্যান্য সবজির মত মাশরুম খনিজ দ্রব্য সমৃদ্ধ। খনিজ

দ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে পটাশিয়াম। এর পরিমাণ [illegible]
রয়েছে ফসফরাস, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের স্থান।

চিত্র ৩ : দুধ-সাদা মাশরুম

চিত্র [illegible]

মাশরুমের ঔষধি গুণও মন্দ নয়। মাশরুম তাই পৃথিবীর অনেক দেশে [illegible] হয়। চীন, জাপান ও কোরিয়াতে মাশরুম অনেক রোগের ঔষধ হিসেবে [illegible] রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এতে চর্বি ও শর্করা কম থাকায় [illegible] রোগীদের আদর্শ খাবার। মাশরুমের ইরিটাডেনিন, লেন্টাস্টিন এবং [illegible] কোলেস্টেরল হ্রাস করার মাধ্যমে হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ নিরাময় করে থাকে [illegible] এসিড ও লোহা থাকায় নিয়মিত মাশরুম খেলে দেহের [illegible] ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-ডি থাকায় শিশুদের দাঁত ও হাড় [illegible]

মাশরুমে লিংকজাই ৮ নামক এমিনো এসিড রয়েছে বলে এটি [illegible] হিসেবে কাজ করে। এতে বিদ্যমান [illegible], গুকেন, লাম্পট্রোল, [illegible] ট্রাইটারপিন, এডিনোসিন ও ইলুডিন ক্যান্সার ও টিউমার প্রতিরোধ [illegible] এটি বর্তমানে এইডস প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। মাশরুমে প্রচুর [illegible] অক্ষম রোগীদের জন্য শক্তিবর্ধক হিসেবে কাজ করে।

মাশরুমে রয়েছে প্রচুর আঁশ যা হজমশক্তি [illegible] রয়েছে এডিনোসিন নামক যৌগ যা রক্ত কণিকার ভারসাম্য রক্ষা [illegible] হিসেবে কাজ করে। এতে প্রচুর এনজাইম রয়েছে যা হজম সহায়ক [illegible] নিরাময়ে। মাশরুমে বিদ্যমান এন্টিঅক্সিডেন্ট মানব দেহের [illegible]

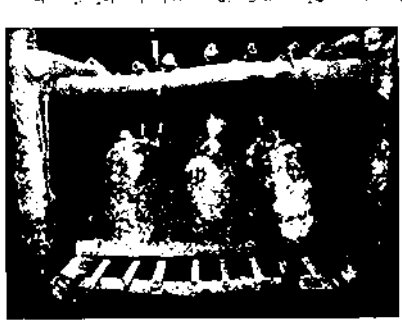

চিত্র ৫ : মাশরুম চাষ পদ্ধতি

এত যে উপকারী মাশরুম তা হাতের কাছে পেতে চাইলে [illegible] বিপণিবিতান থেকে মাশরুম কেনা যায় অথবা সাভারে অবস্থিত মাশরুম [illegible]

এনে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে পারলে বাসায়ও তা উৎপাদন করা সম্ভব। মাশরুম চাষ করতে হলে প্রয়োজন একটি চাষঘর ও জানা দরকার এর চাষপদ্ধতি। ছায়াযুক্ত স্থানে কুঁড়েঘর তৈরি করে মাশরুম চাষ করা যায়। ঘরটিতে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। অবারিত আলোর চেয়ে দিনের আলো পরিমিত পরিমাণে থাকলে সুন্দর ফ্রুটিং বডি বা ফুল বের হয়। চাষঘরের ভেতরকার তাপমাত্রা হতে হয় ২০-৩০° সে.। আমাদের কুঁড়েঘরের ছায়ায় এই তাপমাত্রা সহজেই থাকে। তাছাড়া মাশরুমের প্যাকেটের চারপাশে ৭০-৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকতে হয়।

চাষঘরের ভেতর বাঁশ বা কাঠ দিয়ে ১৫" উপর নিচ করে এক একটি তাক তৈরি করতে হয় তাতে স্পন পেকেটেগুলো সাজিয়ে রাখার জন্য। স্পন পেকেটের দুই পাশের কাঁধ বরাবর উল্টা 'D' আকারে ব্লেড দিয়ে স্পন বহনকারী ব্যাগটি কেটে দিতে হয়। কাটার সময় কাঠের গুঁড়াসহ কিছু মাইসেলিয়াম ব্লেড দিয়ে চেঁছে দিতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত বা কর্তিত মাইসেলিয়াম থেকে ফ্রুটিং বডি বা ফুল বেড়িয়ে আসে। কাটা প্যাকেটগুলো অতঃপর ৫-৩০ মিনিট পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর পানি ঝরিয়ে প্যাকেটগুলো তাকের উপর সাজিয়ে রাখতে হয়। প্রতিদিন এসব প্যাকেটের গায়ে ২-৩ বার পানি স্প্রে করে দিতে হয়। এতে তিন চার দিনের মধ্যেই পিনের মাথার মত মাশরুমের অঙ্কুর বের হয় এবং ৫-৭ দিনের মধ্যেই মাশরুম তোলার উপযোগী হয় (সারণি-১)। তাপমাত্রা বেশি হলে অঙ্কুর শুকিয়ে মারা যেতে পারে।

সারণি-১ : ধাপ নির্দেশিকা : ঝিনুক মাশরুম চাষের প্রধান প্রধান ধাপ

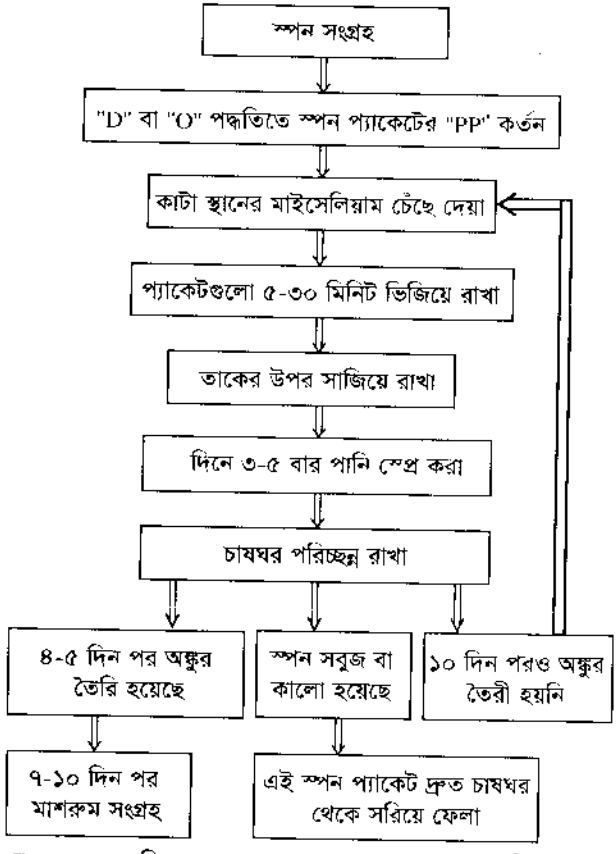

জে এ এম আজিজুল হকের "মাশরুম" গ্রন্থ থেকে গৃহীত

মাশরুমের ফুল বড় হয়ে শিরাগুলো ঢিলা হওয়ায় আগেই মাশরুম সংগ্রহ করা উত্তম। প্রথম বার মাশরুম তোলার পর প্যাকেটগুলোকে একদিন বিশ্রাম অবস্থায় রেখে দিতে হয়। পরের দিন কাটা অংশ আবার ব্লেড দিয়ে চেঁছে দিলে এবং আগের মত নিয়মিত পানি স্প্রে করলে ১০-১৫ দিন পর সেই প্যাকেট থেকে পুনরায় মাশরুম পাওয়া যাবে। এভাবে একটি প্যাকেট থেকে ৭-৮ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়। তাজা বা শুকনা মাশরুম কুসুম গরম লবণ পানিতে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে মাংস বা সবজির সাথে রান্না করে খাওয়া যায়। এতে খাবার পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হয়ে উঠে। শুকনো মাশরুম পাউডার চা, কফি, পায়েস, স্যুপ ইত্যাদির সাথে মিশিয়ে খাওয়া যায়। মাশরুম দিয়ে নানারকম খাবার তৈরি করা যায়। ছোলার বেসন, চালের গুঁড়া, ডিম দিয়ে তাজা মাশরুমের ফ্রাই করা যায়। মাশরুম কর্ণ ফ্লাওয়ার, মুরগির স্টক, কুসুম ছাড়া ডিম, দুধ ইত্যাদি পরিমাণ মত মিশিয়ে মাশরুম চিকেন স্যুপ রাঁধা যায়। নুডুলস্ আর ডিমের সাথে মিশিয়ে মাশরুম দিয়ে মাশরুম নুডুলস্ তৈরি করা যায়। আলু, বাঁধাকপি, ছোলার বেসন আর গাজরের সাথে মাশরুম সহযোগে মাশরুম চপ তৈরি করা যায়।

মাশরুম দিয়ে যেকোনরকম মাংস রান্না করা যায়। মাংসসহ মাংস রান্নার অন্যান্য উপকরণের পাশাপাশি মাশরুম সংযোগে পুষ্টিকর মাংসের তরকারি রান্না করা যায়। পোলাওয়ের চাল, মুরগির মাংস ও মাশরুম দিয়ে অন্যান্য উপকরণ যুক্ত করে মাশরুম চিকেন বিরিয়ানী করা যায়। আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বরবটি, গাজর আর মাশরুমের সাথে প্রয়োজন মাফিক মশলা, লবণ ও তেল ব্যবহার করে মাশরুম সবজি রান্না করা হয়। ডিম, দুধ আর মাশরুমের সাথে একটুখানি লবণ, মরিচগুড়া আর তেল বা বাটার যোগ করে মাশরুম ওমলেটও তৈরি করা যায়।

বনে জঙ্গলে জন্মানো মাশরুম কিছুতেই না জেনে না বুঝে খাওয়া নিরাপদ নয়। মাশরুমের অনেক বিষাক্ত প্রজাতিও রয়েছে। প্রজাতি ভেদে আবার বিষাক্ততার মাত্রারও তারতম্য রয়েছে। কোন কোন বিষ কোষের প্রোটোপ্লাজমকে আক্রান্ত করে, কোন কোনটা আবার স্নায়ুতন্ত্রে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে আবার অন্য কোন কোন মাশরুম প্রজাতি আবার পরিপাকতন্ত্রে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জানাশোনা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত মাশরুমই শুধু খাওয়া নিরাপদ। কোন মাশরুমই তাজা খাওয়া উচিত নয়। ভোজ্য মাশরুমও তাজা খেলে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। খাবার আগে মাশরুম অবশ্যই রেঁধে খেতে হবে।

ড. মো: শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
প্রফেসর, কীটতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
এবং
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আপেক্ষিক তত্ত্বের শতবার্ষিকী

ঠিক একশ বছর আগে ১৯০৫ সালে পেটেন্ট অফিসের একজন কেরানি [illegible] লিখে বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলেছিলেন। প্রবন্ধগুলোর একটি ছিল [illegible] আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ। প্রবন্ধটি পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এবং মানব [illegible] বিপ্লব এনেছিল। আইনস্টাইনের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আপেক্ষিকতাবাদ বা [illegible]

আলবার্ট আইনস্টাইন

সেখানে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, মানুষ এতদিন [illegible] এসেছে তা প্রকৃত পক্ষে সত্য নয়। ঐ পাঁচটি প্রবন্ধের [illegible] বছরের আলবার্ট আইনস্টাইন। ঐ প্রবন্ধ ও তার [illegible] জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক [illegible] (World year of physics) হিসেবে। [illegible] আইনস্টাইনের স্থান কোথায়। শুধুমাত্র এই ঘোষণার [illegible] শতাব্দীর শেষ প্রান্তের একটি জরিপে আলবার্ট আইনস্টাইন [illegible] কোন মণিকোঠায় অবস্থান করছেন [illegible] বিশ্ববিখ্যাত বার্তা সংস্থা রয়টার ও টাইম ম্যাগাজিন ১৯৯৯ [illegible] কয়েক মাস ধরে শুধু বিংশ শতাব্দী নয়, [illegible] সহস্রাব্দব্যাপী সমীক্ষা চালিয়ে এর মধ্যে জন্মগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ [illegible] আনতে চেষ্টা করেন। এই দুই সংস্থা রেডিও, টেলিভিশন এবং [illegible] মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতামত যাচাই-বাছাই করে [illegible] করে তাতে দেখা যায়, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা অন্যান্য যেকোনো ক্ষেত্রের [illegible] মনীষার আসনটি দখল করে নিয়েছেন আলবার্ট আইনস্টাইন। তাই আইনস্টাইন আজ [illegible] সহস্রাব্দের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।

আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালের পর সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁকে [illegible] আত্মারূপেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অতীতের হাজার হাজার বছরের বিজ্ঞান, সাহিত্য, [illegible] সমন্বিত ফসল এই বিজ্ঞানী। এই অর্থে তিনি অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র।

আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞানবর্ষ ২০০৫ উপলক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে তার জীবন, কর্ম, [illegible] নিয়ে প্রচুর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, লেখালেখি হচ্ছে। শিল্পী [illegible] এঁকেছেন, ভাস্কর [illegible] তাঁর মূর্তি বানিয়েছেন, তাঁকে কেন্দ্র করে বেরিয়েছে অসংখ্য জার্নাল, ডাকটিকেট, পোস্টার, [illegible] ছাপানো হচ্ছে বিভিন্ন নিবন্ধ। আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমিতি তার কর্মময় [illegible] বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করছে।

আইনস্টাইন সম্ভবত একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি চিত্র তারকার চেয়েও সাধারণ মানুষের কাছে [illegible] ছিলেন, যাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা শুনতে অবিজ্ঞানীরাও টিকেট কেটে ভিড় জমাত বক্তৃতা [illegible] অনেক কবি ও শিল্পীর জন্মবার্ষিকী পালিত হতে দেখেছি। কিন্তু আইনস্টাইন ছাড়া অন্য [illegible] কথা আমরা ভাবতে পারি না, যাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে এমন বিপুল আয়োজন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে [illegible] করা হয়েছে কখনো। সেমিনার, আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ ও গ্রন্থ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে একজন বিজ্ঞানীর [illegible] ও কর্মকে বুঝাবার এই বিশ্বজোড়া আয়োজন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগায় কি সেই বিশেষ [illegible] আইনস্টাইনকে এত সর্বজনীন ও শ্রদ্ধেয় করেছে।

আপেক্ষিক শব্দের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। আপেক্ষিক শব্দটি হল আপেক্ষিকতার বিশেষণ আর মানে হল অপেক্ষাকৃত। এর বিশেষ্য হল আপেক্ষিকতা। আমরা যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে বলি তখন নিজেদের অগোচরেই আপেক্ষিক বিবেচনা করেই বলি। যেমন আজ গরম এ কথার মানে কালকের অপেক্ষায় আজ গরম মেয়েটি সুন্দরী। মানে ঐ মেয়েটির অপেক্ষায় সুন্দরী। ঘরটি বড় ইত্যাদি এরপরও এই আপেক্ষিকতা সারা পৃথিবীতে এত ঝড় তুলল? প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক।

আইনস্টাইনের আগে দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী ছিলেন নিউটন। নিউটনের মতে স্থান (Space), কাল (Time) ভর (Mass), ধ্রুবক, এগুলো আপেক্ষিক নয়। আইনস্টাইন এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন যে, স্থান, কাল, ভর, ধ্রুবক বা পরম কিছু নয়-এগুলো আপেক্ষিক। তাই আইনস্টাইনের তত্ত্বকে বলা হয় আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। কিন্তু এই কথা বলা মানে আপেক্ষিকতার সব বলা নয়। নয় এটা আপেক্ষিকতার অন্তর্নিহিত কথা

নিউটনের গতির তিনটি সূত্র আর মহাকর্ষ তত্ত্ব দিয়ে মনে হল এগুলো দিয়ে বিশ্বের সব কিছুর বিষয়ক নিয়ম লিখা হয়ে গেছে। কিন্তু আইনস্টাইন নিউটনের কল্পিত বিশ্বপ্রকৃতির ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলল। তিনি বললেন আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চতুর্থমাত্রা বলে একটা জিনিস আছে। আমাদের আশপাশের জিনিস সময় সময় খাটো হয়, আবার লম্বা হয়। দুনিয়াটা বেলুনের মতো চুপসে যায়, আবার ফুলে ফেঁপে ওঠে। অর্থাৎ কিনা যা সবকিছু বিদঘুটে রকম আপেক্ষিক এবং রহস্যময়। আমরা সাধারণ মানুষ স্থান বা কালের চরিত্র নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না; কেননা এগুলোকে আমরা চিরাচরিত সত্য বলে গ্রহণ করি। আইনস্টাইন তা করেননি। তিনি স্থান ও কালের চরিত্র নিয়ে তুলেছেন মৌলিক প্রশ্ন

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই আইনস্টাইনের মনে দেখা দিয়েছিল এই অদ্ভুত সমস্যা। তিনি যদি দৌড়াই একটি আলোর রশ্মির সাথে সাথে সমান বেগে তাহলে সে রশ্মিকে কেমন দেখাবে, কত মনে হবে তার বেগ? তখন তিনি এর জবাব ভেবেছিলেন 'মনে হবে একটা বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ স্থির গতিহীন হয়ে আছে'। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন এটা অসম্ভব। গতি না থাকলে তো থাকে না আলোর স্পন্দন বা কাঁপন, থাকে না আলোর অস্তিত্বই। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন আসলে বিশ্বে আর সবকিছুর গতি আপেক্ষিক হলেও আলোর বেগ নিরপেক্ষ ধ্রুব। যাই হোক আর যেভাবেই মাপা হোক আলোর বেগ সবসময় একই পাওয়া যাবে

আইনস্টাইনের প্রথম কথা হল: নিউটন গোড়াতেই স্থান, কাল, ভর, বেগ এগুলোকে একটা পরম মানদণ্ড ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সত্যি সত্যি পরম মান বলে কিছু কি আছে? ধরা যাক, পরম গতির কথাই কেউ যদি বলে ঘন্টায় ৫০ কিমি. বেগে গাড়িটা ছুটছে। আর যদি তাকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয় ঘন্টায় ৫০ কিমি. কার সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে, তাহলে সে নিশ্চয় বেজায়রকম অবাক হবে। কিন্তু প্রশ্নটির অর্থ আছে। রাস্তার ধারে যদি একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে তুলনায় গাড়ির বেগ ঘন্টায় ৫০ কিমি. ঠিকই। কিন্তু অন্য গতিশীল যানের জন্য, ঐ গাড়ির লোকের জন্য, বিশ্বের বাইরের অন্য কোথাও থেকে দেখলে একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হবে। যেমন কেউ যদি আরেকটা মটরে চেপে একই বেগে উল্টো দিকে ছুটতে থাকে, তাহলে তার কাছে মনে হবে আগের গাড়িটা ছুটে যাচ্ছে ঘন্টায় (৫০+৫০) ১০০ কিমি. বেগে। আবার আগের গাড়ির ভেতরে যে লোকটি বসে আছে তার তুলনায় গাড়ির বেগ শূন্য। তাহলেই দেখা যাচ্ছে কোনো জিনিসের বেগের ধারণা দর্শকের নিজের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। এরপরও আমরা বলি, গাড়ির বেগ ঘন্টায় ৫০ কিমি.। কেননা আশপাশের সব স্থির জিনিস, রাস্তা অর্থাৎ পৃথিবীর সাথে তুলনায় তার বেগ। কিন্তু পৃথিবী কি স্থির? ঐ গাড়িটি দর্শক যদি চাঁদ কিংবা অন্য কোনো গ্রহ থেকে দেখে (যদি সম্ভব হয়) তাহলে তার কাছে এর বেগ কত বলে মনে হবে? সূর্যের চারপাশে ঘোরা পৃথিবী ঘুরছে সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিমি. বেগে। কাজেই তার তুলনায় গাড়ির বেগ কী দাঁড়ায়? বিশ্বে এমন একটি স্থির বিন্দু নেই যার তুলনায় কোনো জিনিসের পরম গতি বের করা যেতে পারে। কাজেই পরীক্ষার সাহায্যে

পরম গতি বের করা অসম্ভব কল্পনা। পরীক্ষায় পাওয়া গেছে, বিশ্বের একমাত্র আলোর বেগই হল পরম। দর্শকের অবস্থা বা গতি যাই হোক না কেন, তার কাছে আলোর বেগের মান সবসময় একই হবে। শুধু তাই নয়, আলোর বেগ হলো চূড়ান্ত বেগ-এর চেয়ে বেশি কোনো জিনিসের বেগ হতে পারে না।

কোনো জিনিসের বেগ যদি হয় প্রচণ্ড রকম, আলোর বেগের কাছাকাছি, তাহলে কি তার বর্তমান দৈর্ঘ্য, সময়ের হিসেবে একই থাকবে? আইনস্টাইন বললেন—থাকবে না, বেগ বাড়লে স্থির কাঠামোর তুলনায় ভর বাড়বে, দৈর্ঘ্য কমবে, কমবে সময়ের হিসেবও। আলোর বেগের অর্ধেক বেগ পর্যন্ত এই পরিবর্তন হবে খুবই ধীরে ধীরে, আলোর বেগের যত কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে পরিবর্তন হবে তত তাড়াতাড়ি। তারপর চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছতে পৌঁছতে ভর হয়ে ওঠবে অনন্ত, দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে শূন্যের কোঠায়, আর সময় যাবে থেমে।

আধুনিক বিজ্ঞানে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ বিশিষ্ট পারমাণবিক কণিকা নিয়ে অনবরতই পরীক্ষা চলছে, সেখানে মিলছে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তের নির্ভুল প্রমাণ। চারমাত্রার জগৎ নিয়ে আইনস্টাইন মহাকর্ষ তত্ত্বের একটা আশ্চর্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিউটন ধরে নিয়েছিলেন, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করার একটা প্রবণতা রয়েছে। তাই মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো জিনিসের গতিপথ বেঁকে যায়—যেমন একটা বলকে সমান্তরালভাবে শূন্যে ছুঁড়ে দিলে সেটা সরল পথে না গিয়ে বেঁকে মাটিতে পড়ে। আইনস্টাইন দেখালেন এই রহস্যের আকর্ষণ শক্তি কল্পনা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে বিশ্বের আসল রূপ কী সেটা জানা দরকার। তিনমাত্রার জগতে রূপ এমন যে, তাতে বস্তুর উপস্থিতি ঘটলেই সেখানে আর ইউক্লিডের জ্যামিতি দিয়ে কাজ চলে না। স্থান যায় বেঁকে, সবচেয়ে সহজ পথ হয়ে দাঁড়ায় বাঁকা রেখা। তাই মনে হয় বলটা কোনো রহস্যময় আকর্ষণের টানে তার সরল পথ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় কোনো চলন্ত বস্তুর দিক বা বেগ পরিবর্তনের একটা প্রধান কারণ হল মহাকর্ষ। কাছে অন্য বস্তু বা মহাকর্ষের উপস্থিতি না ঘটলে চলন্ত বস্তু একই বেগে সরল রেখায় চলতে থাকে। আইনস্টাইন বললেন, অন্য বস্তুর উপস্থিতিতে স্থানের প্রকৃতিই যায় বদলে, তাই চলন্ত বস্তুর পথ যায় বেঁকে। বস্তুর উপস্থিতিতে স্থানের এই অন্তর্নিহিত বক্রতার জন্যই সূর্যের চারপাশে ঘোরে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ। অর্থাৎ আইনস্টাইনের জগতে দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখা দিল ভারি বস্তুর কাছাকাছি স্থানের নিজস্ব বক্রতা।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রথম পরীক্ষার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৯ সালের ২৯ মে তারিখ পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ছবি তুলে দেখা গেল সূর্যের আশপাশে তারার অবস্থান সত্যি মনে হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক অবস্থানের চেয়ে ভিন্ন, আর তাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল তারার আলোর পথ বেঁকে গিয়েছে সূর্যের অবয়বের পাশ দিয়ে আসতে।

পরবর্তীকালে উন্নততর প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটেছে—বেতার দুরবিন, হাবলটেলিস্কোপ। অবিশ্বাস্য অভিকর্ষ শক্তিময় কৃষ্ণবিবরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার কাছাকাছি পৌঁছলে সকল বস্তু, এমন কি আলোও হারিয়ে যায় অতল অন্ধকারে। আর বলাই বাহুল্য; ২য় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে বস্তু আর শক্তির আইনস্টাইন সমীকরণের বাস্তব প্রয়োগ দেখা দিয়েছে পারমাণবিক শক্তির উদ্ভাবনের মধ্যে।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন—আমাদের সমস্ত অজানা রহস্যের মধ্যে কাল বা সময় হচ্ছে সবচাইতে রহস্যময়। আর এই সময় এবং স্থানকে (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) একই পর্যায় এসে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব চতুর্থ মাত্রিক জগতের ধারণা সৃষ্টি করেছে। চতুর্থ মাত্রিক জগতের তিনমাত্রা হল—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং চতুর্থ মাত্রা হল সময়, আমাদের চির পরিচিত ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। যদিও ছবি এঁকে চারটি মাত্রা একসংগে দেখানো অসম্ভব।

বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের চতুর্মাত্রিক জগতের বৈশিষ্ট্য হল এই যেসব জড় কাঠামোয় পদার্থ বিজ্ঞানের আইন একই রূপ নেয়। আবার এক জড় কাঠামো থেকে অন্য জড় কাঠামোতে যেতে শুধুমাত্র লোরেন্স

রূপান্তর সমীকরণই ব্যবহার করা যায়। এটাই হল বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বের শিক্ষা।

অভিকর্ষ-উদ্ভূত হয় একটি ক্ষুদ্র স্থানকাল অংশ থেকে তার নিকটবর্তী অংশের মধ্যে পার্থক্যের জন্যই। এই পার্থক্যকে আমরা বলি অভিকর্ষ, স্থানকালের বক্রতা, বা সাধারণ আপেক্ষিকতা। বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে আইনস্টাইন ইথার তত্ত্বের সমাধি রচনা করেছিলেন। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে গেল শুধু রেখে গেল স্থানকালের বক্রতা।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের আইন এই ভাবে সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের জন্য যে ত্বরণের আবিষ্কার করেছিলেন তা আসলে মহাবিশ্বের বক্রতার প্রকাশ মাত্র। এটাই সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্বের যুগান্তকারী শিক্ষা।

এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত থেকে গণিতের সিঁড়ি বেয়ে আইনস্টাইন যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন সেগুলোও আপাতত-অসম্ভব মনে হয়।

স্থান পরিবর্তন হতে পারে কালে, তেমনি কাল স্থানে।

বস্তু শক্তিতে পরিণত করা যায়, শক্তিকে বস্তুতে।

দর্শক যদি ছোটে প্রায় আলোর বেগে তাহলে স্থান সংকুচিত হয়, কাল প্রসারিত হয়, বস্তুর ভর বাড়ে

আলোর সমান বেগে ছুটলে স্থান সংকুচিত হয়ে শূন্যে এসে দাঁড়ায়, কাল বেড়ে হয় অনন্ত, আর বস্তুর ভর হয়ে দাঁড়ায় অসীম।

অসীম ভরের বস্তুকে নাড়াতে হলে অসীম শক্তির যোগান চাই, কাজেই কোনো বস্তুর পক্ষেই আলোর সমান বেগ অর্জন সম্ভব নয়। আলোর ভর নেই, তাই আলো ছুটতে পারে আলোর বেগে অর্থাৎ আলোক কণিকা বা ফোটনের বিচিত্র জগতে স্থান শূন্য আর কাল সীমাহীন।

আইনস্টাইনের নানা বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের একটি হল দ্রুত বেগবান অবস্থায় সময়ের মন্থরতা। এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয় এভাবে-দুজন যমজ নভোচারীর একজন যদি অপেক্ষা করে পৃথিবীতে আর অন্যজন আলোর কাছাকাছি বেগে দীর্ঘ সময় ঘুরে বেড়ায় মহাশূন্যে নক্ষত্রলোকে, তাহলে সে পৃথিবীতে ফিরে এলে দেখবে তার পৃথিবীর সঙ্গী বুড়িয়ে গিয়েছে অথচ সে রয়েছে তরুণ।

আইনস্টাইনের মতে বিশ্ব জগৎ হচ্ছে ঘটনার বা আলোক তরঙ্গের লীলাখেলা। যখন আমরা বলি, পানি দেখছি তখন বস্তুত আমরা প্রত্যক্ষ করছি পানি হতে আলোর প্রতিফলন রূপ ঘটনাকে। বিশ্বজগতের কোনো বস্তুই স্থির নয়, সবই চঞ্চল ও গতিশীল। আমরা মেপে যে গতি বের করি তা ধ্রুবগতি নয়-আপেক্ষিক গতি। সেরূপ কালেরও কোনো স্থিরতা নেই। কোনো ঘটনা যখন ঘটে, সেই ঘটনার সময়টি যারা ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, তাদের সকলের নিকট এক হতে পারে না। সুদূর নক্ষত্রপিণ্ডে যদি কোনো ঘটনা ঘটে, আর ঐ নক্ষত্র থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে যদি সময় লাগে দশ বছর তবে ঐ নক্ষত্রবাসী যে ঘটনা এখন দেখবে আমরা পৃথিবীবাসী তা দেখবো ১০ বছর পরে। অর্থাৎ নক্ষত্রবাসীর কাছে যা বর্তমান ঘটনা, আমাদের কাছে তা ভবিষ্যৎ এবং আমাদের কাছে যা বর্তমান দূরের কোনো এক নক্ষত্রবাসীর কাছে তা অতীত। সুতরাং ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান সবার কাছে এক নয়, একেক অবস্থানের লোকের কাছে একেক রকম। তাই তারা আপেক্ষিক। আমরা যদি এমন কোনো রকেট সৃষ্টি করতে পারতাম যার গতি হবে আলোর গতির ৪০ গুণ বেশি, তবে ঐ রকেটে চড়ে ৪০ বছর আগেকার কোনো অতীত ঘটনার পেছনে ছুটে তার পুরাভিনয় আবার আমরা দেখতে পেতাম। ৪০ বছর আগে সংঘটিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সব ঘটনাই আমরা আবার এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম।

আইনস্টাইন প্রশ্ন তুলেছেন আমরা অতীতকে মনে রাখতে পারি, কিন্তু ভবিষ্যতকে নয় কেন? অতীতের টেবিলের ওপরের কাপ অনায়াসে ভবিষ্যতের মেঝের অনেকগুলো ভাঙ্গা কাপের টুকরোর দিকে যেতে পারে, কিন্তু উলটোটা কখনো নয় কেন ? কেন আমরা ভাঙা কাপের টুকরোগুলোকে মেঝে থেকে উঠে এক

জায়গায় জড়ো হয়ে জোড়া লেগে টেবিলের ওপর কাপ হতে দেখি না। শুনতে আশ্চর্য লাগে, এও কি কখনও সম্ভব হতে পারে! কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, এও সম্ভব হতে পারে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ মনে হলেও মৌলিক ধারণা অতটা জটিল নয়। তবে ধারণা সহজ হলেও তার গাণিতিক প্রকাশ সহজ নয়। আপেক্ষিক তত্ত্ব বোঝার জন্য গণিতে যে পরিমাণ দখল থাকা দরকার তা আমাদের না থাকায় এ তত্ত্ব আমাদের কাছে এত দুরূহ মনে হয়। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, মাথার যে অংশটি অঙ্ক করে আইনস্টাইনের সে অংশটি অন্যদের তুলনায় ১৫ শতাংশ বড়। তাঁর মেধা অন্যদের চেয়ে এত বেশি যে, অনেকে বলেন–তিনি আসলে পৃথিবীর লোকই নন তিনি গ্রহান্তরের আগন্তুক। এর পরও আইনস্টাইনের মতো লোক তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের গণিতের ভাষা খুঁজে বেরিয়েছেন প্রায় ১০ বছর ধরে। এখানে তাঁকে পথ দেখিয়েছেন তাঁর বন্ধু গ্রেসম্যান। আবার তত্ত্বের সমীকরণ সমাধানের অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সোয়ার্তসচিল্ড, কের, রবার্টসন ও অন্যান্যরা।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশের পর প্রায় ১০০ বছর পার হয়ে গেছে। এর ওপর হাজার হাজার বই প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এর ব্যাখ্যা এখনও অস্পষ্ট হয়ে আছে। আপেক্ষিক তত্ত্ব সহজে না বোঝার কারণ হল (গণিত ছাড়া) জন্মের পর থেকে মানুষ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছে এবং সে সব বিষয় নিয়ে তাঁর অন্তরে যে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি হয়ে আছে, সেই জগৎ থেকে বেড়িয়ে আসতে না পারা। বিজ্ঞান গবেষণার সকল প্রকার ফল গবেষণাগারে পরীক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু আপেক্ষিক তত্ত্ব এমন এক বিষয় যা গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই খুবই দুরূহ কাজ।

বিংশ শতাব্দীর ২য় দশক পর্যন্ত থিউরি অব রিলেটিভিটির মর্ম উপলব্ধির করার মতো জ্ঞান খুব কম লোকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এক সময় মনে করা হত আইনস্টাইন ছাড়া এই থিউরি বুঝার মত ২য় ব্যক্তি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার আর্থার এডিংটন। তখন ভারতের একজন বিজ্ঞানী সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রসেখর নিজে নিজেই এই থিউরি নিয়ে গবেষণা করে এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হন। একজন সাংবাদিক চন্দ্র শেখরের এ বিষয়ে অবহিত হয়ে স্যার এডিংটনকে প্রশ্ন করেছিলেন–শুনেছি পৃথিবীতে থিউরি অব রিলেটিভিটি নাকি বোঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি। এই কথা শুনে এডিংটন একটু থেমে উত্তর দিয়েছিলেন–আমি ভাবতে চেষ্টা করছি ৩য় ব্যক্তিটি কে? আইনস্টাইনের দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল বোদ্ধা আমাদের সময়ের নায়ক স্টিফেং হকিং।

একবার নিউইয়র্কে জাহাজ নোঙর করার পর সাংবাদিকরা আইনস্টাইনকে বললেন, আপনার আপেক্ষিকতত্ত্ব সহজ ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিন। আইনস্টাইন বললেন–'আমার কথা যদি আপনারা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করেন তবে এইভাবে বলতে পারি। আপেক্ষিক তত্ত্বের আগে আমাদের ধারণা ছিল সমগ্র বিশ্ব থেকে বস্তু অদৃশ্য হয়ে গেলেও দেশ আর কাল থাকবে। আপেক্ষিক তত্ত্ব বলে যে, বস্তুর সাথে সাথে দেশ ও কালও অদৃশ্য হয়ে যাবে'।

অন্য এক জায়গায় আপেক্ষিক তত্ত্বকে অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন কিছুটা মজা করে বলেছিলেন–'কোনো পুরুষ একজন সুন্দরীর সাথে এক ঘন্টাকাল বসে থাকলেও সেই সময়টুকু তার কাছে মিনিট খানিকের চেয়ে বেশি মনে হবে না। কিন্তু সেই লোককেই একটি বিরাটাকৃতির তপ্ত কড়াই-এর ওপর যদি এক মিনিট বসিয়ে রাখা হয়, তবে তার কাছে সেই সময়টুকু মন হবে এক ঘন্টার চেয়েও বেশি। আসলে একেই বলে আপেক্ষিকতা'।

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে আশ্চর্য ও দুঃখজনক ঘটনা হল, ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন যখন Ph.D. ডিগ্রি লাভের জন্য তাঁর স্পেশাল থিউরি অব রিলেটিভিটি থিসিস আকারে বার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেন। তার আপেক্ষিকতা অনেক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী

মানতে রাজি হননি, কিন্তু আইনস্টাইনের গাণিতিক যুক্তির সামনে দাঁড়াতেও পারেননি। কথিত আছে, আইনস্টাইন যখন তাঁর নতুন তত্ত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সেমিনারে ব্যাখ্যা দিয়ে বেড়াতেন, তখন অধিকাংশ শ্রোতা তা বুঝতে না পেরে হাসা-হাসি করত। এমন এক পরিস্থিতিতে তিনি একবার বিরক্ত হয়ে দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, আজ আপনারা হাসছেন, কিন্তু আমার তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণিত হলে সুইজারল্যান্ডবাসীরা বলবে আমি সুইস, আর জার্মানিরা বলবে আমি জার্মান। তার মন্তব্য যে যথার্থ ছিল তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নোবেল কমিটি পদার্থবিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের জন্য আইনস্টাইনের নাম ১৯১১ এবং ১৯১৫ এই দু বছর ছাড়া ১৯১০ থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে প্রতি বছরই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ তিনি ১৯২২ সালের নোবেল কমিটি কর্তৃক ১৯২১ সালের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে এই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মৃত্যুর পর ইউরোপের পত্রিকায় একটি ছবি ছাপা হয়–অনেক গ্রহ নক্ষত্র ছুটে চলছে তার একটির গায়ে লেখা আছে এখানে আইনস্টাইন বাস করত। একথা বুঝতে বোধ হয় কারো অসুবিধা হয়নি; এ পৃথিবী নামক গ্রহের পরিচয় আইনস্টাইনকে দিয়ে।

এই মহান বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে দুর্জয়তার অপবাদ দেওয়া হলেও বিশ্বকে জটিল তত্ত্বের জালে জড়িয়ে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় করে তোলা মোটেই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না। তিনি বরং চেয়েছিলেন প্রকৃতিই যে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়, তাকে কতগুলো সহজ তত্ত্ব আর সূত্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে স্বচ্ছ আর স্পষ্ট করে তুলতে।

আলবার্ট আইনস্টাইন কোনো দেশের বা কারো একার সম্পদ নয়, তিনি সমগ্র পৃথিবীর অনন্য সম্পদ। আইনস্টাইন একজন বড় বিজ্ঞানী আর সৃষ্টিশীল উদ্ভাবক হিসেবে যেমন বড় তেমনি বড় মানুষ হিসেবে। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে নিবেদিত একজন সমাজ সচেতন দার্শনিক ও কর্মী হিসেবে। তিনি শুধু শান্তিবাদী নন তিনি ছিলেন শান্তির সৈনিক। মানবতার জন্য গভীর ভালবাসা, মানুষের জীবনের প্রতি অসম্ভব মমত্ববোধ ছিল তাঁর। আজ এই আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞানবর্ষ পালনের এই দুনিয়াজোড়া আয়োজনে আজকে সব বিজ্ঞানী, সব মানুষ যদি তার কাছে থেকে শিক্ষা নিতে পারে বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনার, মানুষের শান্তিময় ভবিষ্যতের সংগ্রামে তার সহযাত্রী হবার তাহলে হবে তার প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা জানানো।

জহুরুল হক বুলবুল
বিভাগীয় প্রধান
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কালিহাতী কলেজ, টাঙ্গাইল

উপকূলীয় সমস্যা

সারা বিশ্বে হাজার রকম সমস্যার মধ্যে পরিবেশগত সমস্যা একটি লক্ষ্যনীয় সমস্যা। সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে অবশ্যই সুস্থ রাখতে হয় কারণ আমরা পরিচ্ছন্নভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাস, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, কাজকর্ম সবই পরিবেশের মধ্য থেকে করে থাকি। পরিচ্ছন্ন বাতাস ছাড়া এর কোনটাই কি করা সম্ভব ?

সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশে যে পরিমাণ বাতাসে বিভিন্ন উপাদান থাকা দরকার তা বহুদিন যাবত নেই। তাই দেখি প্রকৃতির উপর সেচ্ছাচারিতার কারণেই আমরা এবং প্রাণিজগত হুমকির মুখোমুখি হচ্ছি। প্রতিনিয়ত নানান প্রাকৃতিক দূর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা পানিকে, বাতাসকে, মাটিকে, ওজোন স্তরকে সর্বদাই দূষিত করছি বলেই প্রাকৃতিক এই উপাদানগুলো আমাদের ভাল থাকতে দিতে পারছে না। তাই আলোচনা করলে দেখবো এই সমস্যা আমাদেরই সৃষ্ট। একে একে আমরা দেখবো কেমন করে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এই সকল ভুল করে করে মহাবিপদকে ডেকে আনছি।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট বিশ্ব প্রেক্ষাপট হতে ভিন্ন নয়। সারা বিশ্বে চলছে উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তির পেছনে ছোটা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই উন্নয়ন প্রকৃতিকে ধ্বংস করে হতে পারে না। এখনো সতর্ক হবার সময় আছে। শিল্প বিপ্লব মানুষকে মোহমুগ্ধ করেছে এবং বিশ্ব পরিবেশ তথা পানি, স্থল এবং বায়বীয় পরিবেশ সুস্থতা হারাতে চলেছে।

বায়ুমণ্ডলের অসুস্থতাগুলো দৃষ্টিপাত করলে দেখবো দুশো বছর আগে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ছিল প্রতি লক্ষভাগে প্রায় ২৮০ ভাগ এবং ১৯৯৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩৬০ ভাগরে উপর এবং ক্রমাগত তা দ্রুত বেড়েই চলেছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির কারণগুলো -

- বন উজাড় হওয়া;
- শিল্প কারখানার ধোঁয়া;
- গাড়ির কালো ধোঁয়া;
- বর্জ্য আবর্জনা;
- দূষিত তেল নদী, সমুদ্র ও বিভিন্ন জলাশয়ে ফেলা;
- শষ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন কীটনাশকের ব্যাবহার, ইত্যাদি।

গত এক দশকে পৃথিবীর নিরক্ষীয় বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে ১৯০ কোটি হেক্টর থেকে কমে ১৭০ কোটি হেক্টরে পৌঁছেছে। অবশ্য এখন মানুষ সচেতন হওয়ার ফলে এর শতকরা হার কমেছে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। বিশ্ব বিবেককে জাগিয়ে তুলতে মিডিয়াগুলো প্রচুর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ। বিরাট অঞ্চল জুড়ে এর উপকূল। এর উপকূলীয় দেশগুলো জুড়ে রয়েছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমুদ্রের প্রভাব।

পরিবেশ দূষণে এবং বিশুদ্ধতায় সমুদ্রের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। সে কারণে সমুদ্রের প্রতি আমাদের প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখতে হবে। বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণের ব্যাপারে সাগরের শৈবাল এবং ফাইটো প্লাংটন বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এটার জন্য শুধু বাংলাদেশের কথাই বলা চলে না। কারণ আমরা জানি পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ পানি এবং এক তৃতীয়াংশ স্থল ভাগ। পৃথিবীর জলভাগ বেশি হওয়ায় আমাদের সার্বিক পরিবেশের উপর পানির ভূমিকা বেশি। এটা আমাদের বঙ্গোপসাগরের বেলায় সত্য। কিন্তু অহরহ নানা দূষণের ফলে আমাদের পরিবেশ ভারাক্রান্ত।

উপকূলভাগে প্রায় বছর প্রাকৃতিক ডিজেস্টার দেখা যাচ্ছে। ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাস, ২৯ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের উপকূলকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। যেমন ক্ষতি হয়েছিল মানুষের ও প্রাণিকূলের তেমনি বৃক্ষরাজির। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের মানুষ উপকূল সংরক্ষণে ততটা তৎপর হচ্ছে না। কতগুলো কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাচ্ছে দিন দিন।

অপরিকল্পিত বাড়িঘর, ড্রেনেজ, কলকারখানা, আবর্জনা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জাহাজের বর্জ্য, অপরিশোধিত পয়ো নিষ্কাশন, জাহাজ ভাঙ্গার কারখানা, কর্ণফুলী পেপার মিল, কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব, শিল্প কারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাস, রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ওজন অণুকে ধ্বংসকরণ এবং ওজন স্তরে ফাটল-এর প্রভাবে মৌলিকত্ব হারাচ্ছে উপকূলীয় এলাকাগুলো।

বাংলাদেশের প্রধান জমজমাট সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামে। কর্ণফুলী নদীর তীরে তাই অধিকাংশ শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এখানে প্রায় ১৪৪টি শিল্প কারখানা রয়েছে এবং এরা দূষণ সৃষ্টিতে অনবদ্য। এই কারখানাগুলোর নাম শুনলেই বুঝা যাবে এরা কর্ণফুলীকে বধির করে সমুদ্র পানিকে দূষিত করে তুলেছে। ১৯টি চামড়ার কারখানা, ২৬টি বস্ত্র কারখানা, ১টি টি.এস.পি সার কারখানা, ১টি তেল শোধনাগার, ২টি সিমেন্ট, ১টি ইস্পাত, ২টি কীটনাশক, ২টি সাবান, ২টি রং প্রস্তুত কারখানাসহ বিভিন্ন আরো অনেক কারখানা। এসব কারখানা থেকে প্রায় প্রতিদিন কমবেশী ৫০ হাজার কিলোগ্রাম শিল্পবর্জ্য কর্ণফুলীর পানিতে এসে পড়ে। কর্ণফুলী পেপার মিল থেকেই প্রতিদিন প্রায় ০.৩৫ টন 'চায়না ক্লে' এবং এক টন সেলুলোজ ফাইবার বর্জ্য নির্গত হয়। এগুলো অপরিশোধিত অবস্থায় কর্ণফুলীতে গিয়ে উপকূলের পানিকে দূষিত করে। এই বর্জ্যে মিশ্রিত থাকে সোডিয়াম সালফাইড ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যা পরিবেশ দূষণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

তেল দূষণ করতে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়। প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৫০টি তেলবাহী জাহাজ এবং অন্যান্য দেড় হাজারের কমবেশী জাহান নোঙর করে। এসব জাহাজ ধৌতের পানি সরাসরি সাগরের পানিতে ফেলে বিধায় তেলের আস্তরণ সাগরে ভাসতে থাকে।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরে বাৎসরিক তেল চোয়ানোর পরিমাণ ৬,০০০ মেট্রিক টন এবং পরিশোধন কেন্দ্রের ধৌত পানি, অপরিশোধিত তেলের অবশেষ এবং প্রক্রিয়াকৃত তেল নির্গমণের পরিমাণ বছরে ৫০ হাজার মেট্রিক টনের মত। ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে কুতুবদিয়া অঞ্চলে বিদেশী এম.টি ফিলোভী জাহাজ প্রায় ২৫ শত টন তেল নিঃসরণ করেছিল। তৎকালীন সরকার কমিটি গঠন করে বটে কিন্তু এর কাজ মাঝ পথে থেমে যায়। এর পরেও বিদেশী জাহাজের বর্জ্য নিষ্কাশনের ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এ সাগর। এর ফলে সাগর জলে আবরণ পড়াতে প্রয়োজনীয় বায়ুর অক্সিজেন পানিতে মিশতে না পারায় পানিতে বসবাসকারী প্রাণিকূলের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। তাছাড়া, সূর্যের আলো পানিতে প্রবেশ করতে না পারায় পানির তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে মাছেরা তাদের আবাস স্থল ত্যাগ করছে।

জাহাজ ভাঙ্গার কারখানা ফৌজদারহাট এবং মংলা বন্দরের কাছাকাছি এলাকায় গড়ে ওঠাতে জাহাজ ও ইঞ্জিনের তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ সকল এলাকায় ফাইটোপ্লাংকটনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে এ সকল এলাকার পানিতে বসবাসকারী কাকড়াজাতীয় প্রাণিকূল বিপন্ন হচ্ছে।

কীটনাশকের ব্যবহারে কৃষকগণ অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সুখ যে আমাদের জীবনকে কোন দুর্যোগের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তা ভাববার জন্য বিজ্ঞজনের বড্ড অভাব। এই কীটনাশক যেমন ফসলকে বিষাক্ত করে তেমনি এগুলো পানি স্রোতে মিশে গিয়ে নদী, খাল হয়ে সাগরে যেয়ে মিশে। এতে ফসল ভূমির উর্বরতা হারাচ্ছে খুব ধীর গতিতে এবং ভূমিতে বিভিন্ন রাসায়নিক সার ব্যবহার ভূমি, পানি ফসলকে বিষাক্ত করে প্রাণিকূলের (মানুষ, প্রাণি, মাছ) শ্লো গতিতে ক্ষতি করে যাচ্ছে।

চারি ধারে বিষ, বিষাক্ত বাতাস, ফসল, মাছ, মাংশ, ফল-ফলাদি, তরি-তরকারী সবই বিষাক্ত। বাঁচার

উপায় খুঁজতে হবে। এসব মরণদায়ী এটোম বোমের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আজকে রব উঠেছে সুন্দরবন বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। কথাটার মধ্যে একশত ভাগ সত্য রয়েছে। নানা কারণে সমুদ্র উত্তপ্ত হয়ে জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল বিভিন্নভাবে ধ্বংস হচ্ছে। সুন্দরবনের বৃক্ষরাজি, প্রাণিকূলের অস্তিত্ব আজ সংকটের সম্মুখীন। এর জন্য যে সমুদ্রই দায়ী তা নয়। চোরাচালানীরা বৃক্ষ নিধন করে যাচ্ছে। হরিণ ও বাঘ শিকার করে চোরা শিকারীরা এসব প্রাণিদের শঙ্কিত করে তুলছে। প্রতিনিয়তই বাঘ, সাপ, হরিণের চামড়া এবং অন্যান্য প্রাণির চামড়া চোরা পথে বিদেশে পাচারের খবর পাওয়া যায়। যার ফলে প্রাকৃতিক চেইন ভেঙ্গে ভারসাম্য হারাচ্ছে। যে হারে গাছ ও প্রাণি নিধন হচ্ছে সে হারে ত পুনঃ স্থাপিত হচ্ছে না।

নদীর ভাঙ্গনকে রোধ করা যাচ্ছে না। নদীকূলে গড়ে ওঠা শত শত জনপদ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে। মানুষ ভূমিহীন হচ্ছে, হচ্ছে নিরাশ্রয়। এই নদী স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই মাটি বিধৌত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়ে সমুদ্রের নিম্নভূমি ক্রমাগত উঁচু হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে হিমালয় হতে বয়ে আসা এবং ভারত হতে বাঁধ খুলে দেয়া বিপুল পানি স্রোত নদী উপকূল ও সমুদ্র উপকূলে সমস্যার সৃষ্টি করছে। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফসলের ভূমি, মানুষ, প্রাণিকূলের বসত ভূমি, জীবন ও খাদ্য।

আমরা জানি গ্রীন হাউস এফেক্টের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বিশেষ করে হিমমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে ওঠেছে এবং মেরু অঞ্চলের ও হিমবাহের বরফ গলতে শুরু করেছে। সাগরের পানির আয়তন বেশি হচ্ছে এবং পৃথিবী জুড়ে সাগরের আয়তন বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল তলিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের মত বদ্বীপ অঞ্চলের দেশে সমুদ্র তীরের বিশাল এলাকা পানির নীচে তলিয়ে যাবে, কোটি কোটি লোক গৃহহারা হয়ে পড়বে।

এখন প্রশ্ন উঠছে কারা সমস্যার সৃষ্টি করছে, আর কারা এর কুফল ভোগ করছে ? আজকে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর সম্মুখে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দায়ী প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলো। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিল্পায়ন হচ্ছে খুবই কম। তারা জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে নিতান্ত কম পরিমাণে এবং এসব দেশে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন জাতীয় ক্ষতিকর গ্যাসের ব্যবহার নাই বললেই চলে। তাই শিল্পোন্নত দেশগুলোকে এ ক্ষতির ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে এবং পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে।

পৃথিবীর পরিবেশগত বড় সমস্যাগুলোর প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করা আজ আমাদের যেমন প্রয়োজন তেমনি নিজেদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া তেমন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেমন -

উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ করা এবং বাঁধকে সংরক্ষণ করার জন্য জনগণের সচেতনতা বাড়াবার জন্য তাদেরকে শিক্ষা দান দরকার।

দেশ বাঁচাতে হলে নিরক্ষরতা দূরিকরণ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। আত্ম সচেতনতা অবশ্যই প্রয়োজন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নদী ও সমুদ্র উপকূলকে কোনভাবেই দূষিত করা যাবে না।

অপরিকল্পিত মৎস্য আহরণ ও পোনা নিধনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সচেতন করে তুলতে হবে।

নদীভাঙ্গন রোধ করতে হবে এবং নদী স্রোতের গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সমুদ্র উপকূলে তেল নিঃসরণ তা দেশী বা বিদেশী জাহাজ থেকে হোক তা বন্ধ করতে হবে।

জাহাজ ভাঙ্গা কারখানার বর্জ্য নিঃসরণ বন্ধ করতে হবে।

চাষের জমিতে কীটনাশক, অজৈব সার দেয়া বন্ধ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন দেয়া বন্ধ করা প্রয়োজন। এ ধরনের ফরমালিন মৎস্য উৎপাদন (সমুদ্র উপকূল) স্থলে ব্যবহার হয় ফলে পানিতে চলে যায়। পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

এসব বন্ধ করার জন্য কঠোর অইন এবং প্রয়োগ চাই। আজকে আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে, এবার আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

বি: দ্রঃ আমি ভোলা জেলায় উপকূলীয় বিবিধ সমস্যার মধ্যে বেড়ে উঠেছি। ঝড়-ঝঞ্ঝা, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস এবং বিবিধ রোগ-শোক, মহামারির মুখোমুখি হয়েছি বহুবার। এবার চাই এই উপকূলবাসী মানুষের মত বাঁচুক। যখন-তখন বাঁধ ভেঙ্গে জনবসতিকে ভাসিয়ে নিয়ে না যাক, নোনা পানি ঢুকে সবুজ ফসলের মাঠকে হলদে করে বিবর্ণ করে দিয়ে না যাক তাই চাই। বাঁচতে চাই উপকূলবাসিরা, বাঁচতে শিখতে চাই।

ড. আকন্দ সামসুন নাহার
৮/বি, লেকরিপেল
১১/ডি, নায়েম রোড, ধানমণ্ডি
ঢাকা-১২০৫

মহাকর্ষের কড়চা

দীর্ঘ ১২০০০ বছর আগে বিদায় নিয়েছে শেষের শক্তিশালী তুষার যুগ। আর তখন থেকেই [illegible] পা বাড়িয়েছে সভ্যতার দিকে। সৃষ্টি জুড়ে বিশাল কর্মকাণ্ড ভাঙা গড়ার খেলা অহর্নিশ। [illegible] মানুষগুলোর মনেও হয়তো তার ঢেউ এসে পৌঁছে ছিল। বুঝতে পেরেছিল, শুধু তারাই নয়, [illegible] প্রতিটি সত্তাই যেন কোন এক অদৃশ্য বাজীগরের ইঙ্গিতে অভিনয় করে যাচ্ছে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে। [illegible] নেই। অর্কেস্ট্রার তালে, নৃত্যের ছন্দে প্রাণময় নিখিলভুবন। নিয়মের নিগড়ে ছন্দবদ্ধ [illegible] আপেল তাই বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটির পরশ পায়, গ্রহ-তারা আপন পথে একে বেঁকে চলে। [illegible] সবকিছু কোন না কোন এক নিয়মে বাঁধা, আর নিয়ম না থাকলে তো অস্তিত্ব থাকে [illegible] চাবিকাঠিটি রয়েছে মহাকর্ষের হাতে। প্রকৃতি ছলনাময়ী, তার নিয়ম তাই রহস্যে ঘেরা। [illegible] করে, নিয়মের খোঁজে, কিছু মানুষের নিরলস প্রচেষ্টা, তাদের সাফল্য আর ব্যর্থতার কাহিনী [illegible] ইতিহাস।

প্রকৃতির চারটি শক্তির মধ্যে মহাকর্ষ অন্যতম। নিউক্লিয় শক্তি দুটোর প্রভাব [illegible] ছোট্ট জগৎটুকুতেই সীমিত। সে এক আশ্চর্য পৃথিবী, সেখানে সব ঘটনাই অনিশ্চিত। [illegible] যেন পয়সার এপিঠ-ওপিঠ দুয়ের মিলনে আলোর পথ। তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি দূরদূরান্তে [illegible] গ্রহ-নক্ষত্রের উদাসীনতায়, তা নিষ্ক্রিয়। চতুর্থ মৌলিক শক্তি "মহাকর্ষ" [illegible] প্রকৃতির সবকটি শক্তির মধ্যে দুর্বল, তবু মহাকর্ষের অনিবার্য প্রভাব থেকে কারও নিস্তার [illegible] থেকে গ্যালাক্সির সুপারক্লাস্টার, এমনকি কৃষ্ণ-বিবরও মহাকর্ষের নিষ্ঠুর পেষণে কখনো স্থির। [illegible] বিজ্ঞানের ইতিহাসে মহাকর্ষ নিয়ে কত প্রাচীন কাল থেকে কত কথা, কত আবিষ্কার, [illegible] সোনালী স্বপ্ন আঁকা হয়েছে। নিয়তির নিয়ামক মহাকর্ষ বহু শতবর্ষ মানুষকে বেঁধেছিল [illegible] শেকল মানুষ আজ ভেঙেছে, রকেটকে Escape গতিতে ছুটিয়ে মহাকর্ষকে ফাঁকি দিয়েছে, [illegible] উপগ্রহে। তবু মহাকর্ষ মানুষের অস্তিত্বের আশ্বাস-জন্ম থেকে মৃত্যু প্রতিটি মুহূর্ত মানুষ মহাকর্ষ [illegible] বাঁচে। আকাশ পারে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কালে কত না অদ্ভুত সব নৈসর্গিক ঘটনা, বুঝিতে [illegible] না। সেগুলো স্পষ্ট করতে মহাকর্ষীয় জ্ঞানকে হাতিয়ার করতে হয়েছে। নিউটন থেকে আইনস্টাইন, মহাকর্ষীয় সূত্র থেকে আপেক্ষিকতাবাদ, মানুষকে সে লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে গেছে। [illegible] দরকার মহাকর্ষ নিয়ে শেষ কথা এখনও বলা হয়নি।

অনেকের বিশ্বাস, মাটিতে আপেল পড়া দেখে নিউটনের মনে মহাকর্ষের ধারণা এসে ছিল। [illegible] যদিও তিনি মহাকর্ষের জুতসই বর্ণনা দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৬২০-এর দশকেই ফরাসী দার্শনিক [illegible] গ্যাসেন্ডি মহাকর্ষ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। গরীব ঘরের সন্তান [illegible]

চার্চের প্রেপোস্ট হয়েছিলেন। মহাকর্ষ নিয়ে তার ধারণা [illegible] একরকম "বস্তুর প্রতিটি [illegible] সাথে এই সুতোর টানে আপেল মাটিতে পড়ে"। [illegible] বেশি ভারী [illegible] বস্তুটিতে রয়েছে [illegible] অনেক বেশি সুতোর বাঁধন, মাটির টানও তাই বেশি। [illegible] এও অনুমান করলেন, বস্তুর আকর্ষণ গ্রহ-তারা [illegible] পর্যন্ত জমায়। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না, কি করে [illegible] নৈসর্গিক বস্তুরা ঘুরে বেড়ায়, কি করেই বা মহাকর্ষ এদের ওপর কাজ করে।

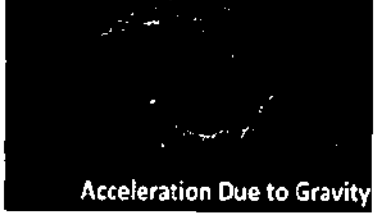

নিউটনের অভিকর্ষীয় তত্ত্ব সহজ, সরল, সুন্দর। এতে বস্তুরা একে অন্যকে টানে; আকর্ষণের শক্তি ভরের ওপর বর্তায়। বস্তু দুটো কি দিয়ে তৈরী, তাদের গঠন-ই বা কেমন এমন জটিল তত্ত্বের কচকচানি নেই। ভল্টেয়ার তাঁর "Philosophie de Newton" গ্রন্থে নিউটনীয় চিন্তাধারার কিছু ছবি এঁকেছেন। যে কারণে সব বস্তুর টান পৃথিবীর মাঝ বরাবর রেখা ভেদ করে চলে যায়, সেটি তাঁর গভীর চিন্তায় ধরা পড়েছিল। আর এ থেকেই এসেছিল বিষম বর্গীয় সূত্রটি। ফলে, মহাকর্ষীয় বল বস্তুর ভরের ওপর শুধু নয়, দূরত্বের ওপরও নির্ভরশীল। তবে ভর বাড়লে শক্তি বাড়ে, আর ব্যাবধান বাড়লে শক্তি কমে। গণিতের এক নতুন শাখা 'ক্যালকুলাস" দিয়ে নিউটন দেখান, তাঁর মহাকর্ষীয় সূত্র মেনে গ্রহরা উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে।

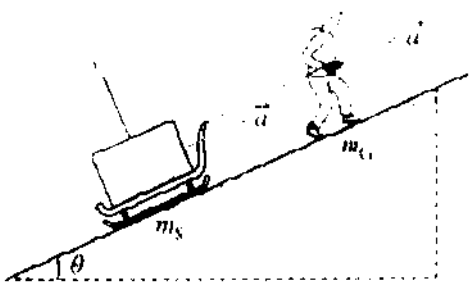

The magnitude of the acceleration due to gravity

এখানে নিউটন ও তাঁর "Calculus" নিয়ে দু-একটা কথা বলা অকারণ হবে না। নিউটনের প্রতিভা অনন্য, কিন্তু মন অনুদার। অন্যান্য শিক্ষাব্রতীদের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি বিবাদ-বিসংবাদের পর্যায়ে ছিল। এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন ফ্যামস্টিড নিউটনের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত করেছিলেন। কোর্ট নিউটনকে "চুরি করা তথ্য" বিতরণে বাধা দেন। ফ্যামস্টিডের দেওয়া অনেক তথ্য ছিল নিউটনের বিখ্যাত গ্রন্থে "Principle Mathematica"। জার্মান দার্শনিক গডফ্রেড লাইবনিজ (Godfred Leibnitz) এবং নিউটন স্বতন্ত্র উপায়ে (Calculus) আবিষ্কার করেন। এঁদের মধ্যে কে প্রথম, এ বিবাদে জড়িয়ে পড়েন তখনকার প্রায় সব বিজ্ঞানী। নিউটনের পক্ষে বন্ধুরা অনেক লেখা প্রকাশ করেন পরে সেগুলো নিউটনের নিজের হাতে লেখা বলে জানা যায়। শুধু তাই নয়, রয়াল সোসাইটির কর্তা হবার সুবাদে তিনি লাইবনিজের বিরুদ্ধে কারসাজি করে রিপোর্ট লেখেন, অন্যের রচনা চুরির দায়ে লাইবনিজকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। এতেও থামেন নি, লাইবনিজের মৃত্যুর পর তিনি মন্তব্য করেন, "ওকে ব্যাথা দিয়ে আমি খুব শান্তি পাই।" প্রতিভা বিরল, নীচতা অতল!

যুগযুগান্তরে মানুষ নির্নিমেষে চেয়ে থেকেছে আকাশপানে, বুঝতে চেয়েছে গ্রহ-নক্ষত্রের বিচিত্র আকাশখেলা, তাদের আনাগোনা আর গতিবিধির রহস্য। এখন নিউটনের মাহাকর্ষীয় সূত্র বলে দিল, আকাশের নীল চাদরে নৈসর্গিক বস্তুরা কিভাবে চলাফেরা করে। মহাকর্ষ প্রভাবে সীমাহীন মহাশূন্যের পটে ভেসে বেড়ায় স্বর্গীয় বস্তুরা-গ্রহ-নক্ষত্র, উপগ্রহ; আর এই, মুক্ত মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় নিউটনীয় সূত্রেরও মূল্যায়ন হল। মানুষ জানুক বা না জানুক, নিয়ম ছিল সৃষ্টির শুরু থেকেই, তবে তা ছিল নাগালের বাইরে, জ্ঞানের বাইরে; নিউটন ভগীরথ হয়ে সেই জ্ঞান-গঙ্গা বয়ে আনলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে; অজ্ঞান অভিশাপে ঘুমিয়ে পড়া সাগর পুত্রেরা জ্ঞানের অমৃত সিঞ্চনে ধন্য হল!

কোটি কোটি বছর এক নাগাড়ে মুঠো মুঠো তেজ ছড়িয়ে আসছে সূর্য। কোথা থেকে, কি করে দেদার এই অগ্নিপ্রভা তৈরী হয় – এ নিয়ে রহস্য ছিল, জল্পনা-কল্পনা ছিল। লর্ড কেলভিন এবং ব্যারণ হেল্মোজ বললেন, মহাকর্ষ-ই নাক্ষত্রিক শক্তির মূল কারণ। অবশ্য এ ধারণায়, সূর্যের বিপুল তেজ রহস্যের সুরাহা হল না। এরপর নক্ষত্রের গঠন নিয়ে চারটি সমীকরণ দেন আর্থার এডিংটন। ১৯৩৮ সালে হ্যান্স বিথ্ তাঁর পঞ্চম সমীকরণে দেখান,"ফিউশন" প্রক্রিয়ায় কিভাবে সৌরতাপ তৈরী হয়। সমীকরণগুলোতে, মহাকর্ষের প্রধান ভূমিকা না থাকলেও, সূর্য কিন্তু ফিউশন নিয়ন্ত্রণে মহাকর্ষকে কাজে লাগায়। মহাকর্ষের দৌলতে নিজের চেহারাটিও পায় সূর্য

এখন আমরা জানি, মহাবিশ্ব অনন্ত নয়, অনড়ও নয়। সচল ব্রহ্মাণ্ডের আভাস রয়েছে নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বের গভীরে, যেখানে মহাকর্ষ কেবল আকর্ষক। অথচ বিশ শতকের আগে কেউ ভাবেন নি, কেউ বলেন নি – মহাবিশ্ব বাড়ছে, না কমছে। যেন ধরেই নেওয়া হয়েছিল, ব্রহ্মাণ্ড চিরটাকাল একই ছিল,

আছে আর একই থাকবে, অথবা অতীতের কোন এক সময়ে তৈরী ব্রহ্মাণ্ডটি মোটামুটি একই অবস্থায় আছে, বিশেষ কোন রদবদল হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, আর সেই গভীর ছাপ থেকেই এমন বিশ্বাস। নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্ব পরিষ্কার বলে দেয়, নিখিলবিশ্ব স্থির থাকতে পারে না। কিন্তু যাঁরা তত্ত্বটি বুঝতেন, তাঁরা ভাবতে পারলেন না, বলতেও পারলেন না যে বিশ্ব সচল, বিশ্ব বিস্তারশীল, বিপুল গতিতে বিস্তার তার হয়েই চলেছে। বরং তাঁরা বিকর্ষী মহাকর্ষীয় এক শক্তি আমদানি করে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার আটকে দিলেন। তাঁরা বললেন, কাছাকাছি নক্ষত্রের মাঝে আকর্ষণ আর দূর নক্ষত্রের মাঝে বিকর্ষণ-জ্যোতির্মণ্ডলীয় বস্তুদের টান ও ঠেলন মিলে বল-সাম্য রক্ষা হয়, ব্রহ্মাণ্ড সুস্থিতি পায় – না বিস্তার, না সংকোচন, ব্রহ্মাণ্ড ত্রিশঙ্কু অনড় হয়ে পড়ে থাকে অনন্তকাল। কত অবাস্তব কল্পনা। স্বয়ং আইনস্টাইন পর্যন্ত মহাবিশ্বের স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রসারণ রুখে দিয়েছিলেন "মহাজাগতিক ধ্রুবক" দিয়ে। পরে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছিলেন, "Cosmological Constant is the greatest blunder of my life"। স্থির

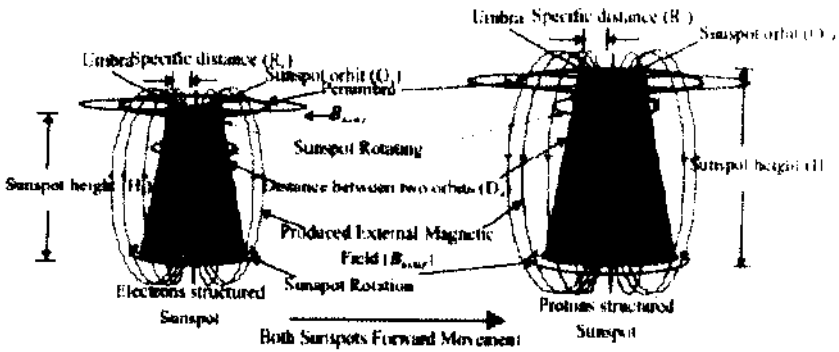

Both the electrons and protons sunspots, it also shows some parameters. Penumbral formed by granules at photosphere

বিশ্বের কল্পনায় পুরো ব্রহ্মাণ্ড নড়বড়ে হয়ে পড়ে। কারণ দুটো নক্ষত্র কোন কারণে কাছাকাছি হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে টান বেড়ে তা বিকর্ষী শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়; সমতা ফিরিয়ে আনতে নক্ষত্রগুলো একে অন্যের ঘাড়ে হুড়মুড় করে পড়তে থাকে। নিস্বর্গে সৃষ্টি হয় চরম বিশৃঙ্খলা আর অস্থিরতা। অন্যদিকে নক্ষত্রের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেলে বিকর্ষী শক্তি প্রবল হয়ে আকর্ষী শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়। আর তারারা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডে বিশৃঙ্খলা ?

গণিত ও মহাকর্ষের নিউটনিয় ধারণাকে ভিত্তি করে পদার্থ বিজ্ঞানের যে মনোরম সৌধ গড়ে উঠেছিল বিশ শতকের গোড়াতেই তাতে চিড় ধরতে থাকে। মাকারী গ্রহের ব্যতিক্রমী চলন পথের ব্যাখ্যা দিতে পারলনা নিউটনের পদার্থবিদ্যা। আদতে নিউটনিয় নিয়মের অন্তর্ভাবনাই এর অন্তরায়। নিউটনের মহাকর্ষীয় বল কি সরে নিমেষে বহু দূরের বস্তুর উপর কাজ করে ? স্থানান্তরে যেতে দ্রুতগামী আলো, যেখানে কোটি কোটি বছর যেতে সময় নেয় সেখানে মহাকর্ষীয় শক্তি কি করে মুহূর্তে পৌঁছে যায় ? প্রশ্নগুলো ছুড়ে দেয়া হয়েছিল নিউটনকে। উত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন, I do not feign hypothesis (non fingo hypothesis) অর্থাৎ, আমি অনুমান করি না। নিউটনের সময়কাল অবশ্য মহাকর্ষীয় বলের তৎকালীনতার জন্য প্রস্তুত ছিল না যিনি এ বিষয়ে আলো দেখাবেন তিনি তখনও পৃথিবীর আলো দেখেননি।

আইনস্টাইনের নিজের কথায় রাজনীতি আর সমীকরণ নিয়ে তার জীবন। রাজনীতি তাকে শান্তি দেয়নি প্রতিষ্ঠা দেয়নি। সমীকরণ তাকে খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন,"সমীকরণ আমার কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ন। রাজনীতি বর্তমান নিয়ে, কিন্তু সমীকরণ চিরন্তন।" ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে মহাকর্ষকে আমল দেননি, গ্যালেলিও অনপেক্ষ দেশকালের ধারণা বাতিল

করেন। তত্ত্বটির মূল কথা ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই আলোর চেয়ে বেশি জোরে ছুটতে পারে না এবং সব জায়গায় সকল ঘটনায় আলোর গতি এক। তত্ত্ব ভালভাবে উতরে গেল, তবে নিউটনের মহাকর্ষ ভাবনার শরিক হতে পারল না। নিউটনিয় চিন্তায়, দুটো বস্তুর মধ্যের ব্যবধান বলে দেয় তাদের ভিতরকার আকর্ষণ কতটা। অর্থাৎ এক বস্তুর সামান্য নড়ন চড়নে অন্য বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল আকর্ষিক শক্তি বদলে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায়, নিউটনের মহাকর্ষীয় প্রভাব আলোর গতি ছাড়িয়ে অসীম গতিতে ছোটে। অথচ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে এটা একেবারেই অসম্ভব। আইনস্টাইন বুঝলেন গোড়ায় কিছু গলদ আছে। ১৯০৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি এমন এক মহাকর্ষীয় তত্ত্ব বের করতে চাইলেন যেটি তার বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বাদ সাধবে না। শেষে ১৯১৫ সালে তিনি "আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব" পেশ করেন। যুগান্তকারী প্রস্তাবটিতে, মানুষের এতদিনকার ধ্যানধারণা যেন এক ঝড়ো হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে যায়, অনাপেক্ষিক থেকে আপেক্ষিক দুনিয়ায় মানুষের উত্তরণ হয়। অ-ইউক্লিডিয় জ্যামিতির সাহায্যে আইনস্টাইন মহাকর্ষের সাথে দেশকাল জুড়ে দেন। এই মহামিলননে মহাকর্ষ আর শক্তি নয় অন্য শক্তিগুলোর মত, মহাকর্ষ তখন বস্তুর ভর আর শক্তির ঠাসবুননে বোনা বঙ্কিম দেশকালের পরিণতি। আইনস্টাইন দেখান, মহাকর্ষের জন্য বস্তু "দেশকালে" ভাঁজ ফেলে। বস্তুর ভরের জন্য মহাকর্ষ, মহাকর্ষের জন্য স্থান-কালে কুঞ্চন, আর কুঞ্চনের জন্য বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ। অন্যভাবে বলা যায়, মহাকর্ষ "দেশকালের" জ্যামিতিক ব্যবহার। ভর ও মহাকর্ষের জন্য বস্তু যখন তার চার পাশের স্থানকে ভেঙেচুরে বাঁকিয়ে দেয়, স্থান তখন বস্তুকে বলে, কিভাবে বস্তুকে ঐ বাঁকা জায়গায় চলাফেরা করতে হবে। তাই বস্তুর মত স্থানও সচল হয়ে ওঠে: মহাজাগতিক নাচে কেউ বসে নেই, কোন নিথর দর্শকও নেই; সকল নৈসর্গিক বস্তু, গ্রহ-তারা থেকে শুরু করে অণু-পরমাণু-কোয়ার্ক সবাই আপন আপন নাচে মশগুল জীবনে এবং মরণেও। আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় ধ্যান-ধারণা বেশ জটিল, সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। শোনা যায়, আশি বছর আগে স্যার আর্থার এডিংটন নাকি বলেছিলেন, পৃথিবীতে মাত্র দুজন মানুষ "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ" বোঝেন, একজন স্বয়ং তিনি, অপরজন আইনস্টাইন। যা হোক, সামান্য ধারণার জন্য একটা উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ঃ এক বিশাল বড় ত্রিপল মহাজাগতিক দেশকাল জুড়ে বয়ন করা হয়েছে, সারা ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে এর বিস্তার। এর ঠিক মধ্যিখানে নক্ষত্রের মত ভারী একটা বস্তু রাখলে টানটান ত্রিপলেও ভাঁজ পড়ে। এবার গ্রহের মত হালকা কোন বস্তু ত্রিপলের অন্য কোথাও বসিয়ে দিলে, সেটি মাঝের ভারী বস্তুটির দিকে গড়িয়ে যেতে চায়। এক বস্তুর আরেক বস্তুর দিকে গড়িয়ে যাবার স্বাভাবিক এই ঝোঁক-ই মহাকর্ষীয় টান, আর এটার মূলে রয়েছে ত্রিপলের ভাঁজ। স্থান-কালের মহাজাগতিক বাঁকানো কাঠামোয় নীড় বাঁধা বস্তুরা ঠিক এমনটিই করে থাকে। তাই তো, পৃথিবীর মত বস্তুর বাঁকানো কক্ষপথে সরলরেখায় ঘোরে, মহাকর্ষীয় শক্তির জন্য নয়; সৌরভরে স্থানকাল বেঁকে যাওয়ার জন্য।

নিউটন এবং আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় নিয়মগুলো পরিণামে উনিশ-বিশ, তাহলেও আইনস্টাইনের প্রস্তাবে বাড়তি কিছু সুবিধা আছে – নিউটনের মহাকর্ষ-ভাবনার অস্বচ্ছতা আর থাকে না, মহাকর্ষ নিয়ে মানুষের চেতনাও বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যায়। মার্কারী গ্রহ যে পথ ধরে সূর্য পরিক্রমা করে তা কিছুটা ব্যতিক্রমী, নিউটনের সূত্র এর ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ মার্কারী, মহাকর্ষ প্রভাবও সবচেয়ে বেশি; কক্ষটি তাই বেশ কিছুটা লম্বা। "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে" আভাস ছিল ঃ উপবৃত্তের লম্বা অটি দশ হাজার বছরে মাত্র এক ডিগ্রি করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ১৯১৫ সালের এক পরীক্ষায় এটির সমর্থন পাওয়া যায়।

নিউটনীয় মহাকর্ষের তাৎক্ষণিক তৎপরতা এতদিন হেঁয়ালী ছিল। দুটো দূর বস্তুর মধ্যে তৎকালিন মহাকর্ষ বোঝাতে, সাধারণ তত্ত্ব বলেছে ঃ এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে প্রভাব ছুটে যেতে পারে না; আর আলোর চেয়ে কোন কিছুই তো জোরে যেতে পারে না; তাহলে প্রভাব তাৎক্ষণিক হয় কি করে ? আদতে, ভরের জন্য মহাকর্ষ বস্তু দুটোর মাঝের "স্থানকালটুকু" বাঁকিয়ে দেয়; দূর হয় নিকট-মনে হয় প্রভাব-ই তাৎক্ষণিক।

সাধারণ তত্ত্বের আর একটি আগাম আভাস : আমরা জানি, কোন ভারী বস্তুর চারপাশের স্থানকাল
ভাঙাচোরা মহাকর্ষ প্রভাবে। ঐ বাঁকানো স্থানকালে আলোর রশ্মিরও অব্যাহতি নেই-মহাকর্ষ নিগড়ে
আলোও ভারী বস্তুর দিকে বেঁকে যায়। সাতটি ভিন্ন রঙের মিশেলে আলো কলঙ্কী, তবু শ্বেতবর্ণা। সে আলোকে
বাঁকাপথে চলতে দেখে আমাদের চিরন্তন বিশ্বাস হোচট খায়। কিন্তু আইনস্টাইনের বিশ্বাস অক্ষরে অক্ষরে
মিলেছিল। সূর্য ভারী নক্ষত্র, দূরদূরান্তের নক্ষত্র থেকে চুঁয়োনো আলো সূর্যের দিকে বেঁকে যায়, কিন্তু সূর্যের
প্রখর আলোয় নক্ষত্রের মিটিমিটি আলো দুর্নিরীক্ষ্য। গ্রহণের সময় সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে চাঁদে, নক্ষত্র
নিরীক্ষণে তখন আর কোন বাঁধা থাকে না। পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপসাগরে প্রিন্সিপ দ্বীপ, ১৯১৯ সালের
গ্রহণের সময় এক ব্রিটিশ অভিযাত্রীদল সেখানে জড়ো হলেন। তাঁরা নক্ষত্র থেকে ছিটকে আসা আলোর
গতিপথ মাপজোখ করলেন এবং দেখলেন আইস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের কথা হুবহু মাথায়
রেখে নক্ষত্র-আলো সূর্যের দিকে বাঁক নিয়েছে। তত্ত্ব আর তত্ত্ব রইলো না তা হল পরীক্ষিত সত্য।
আইনস্টাইন রাতারাতি কিংবদন্তী হয়ে গেলেন।

মহাকর্ষের জন্য ভারী বস্তু আলোকে বাঁকিয়ে দেয়। এর জন্য দূর আকাশে অনেক বিরল মহাজাগতিক
ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। মহাকর্ষীয় লেন্সিং, আইনস্টাইনের ক্রস বা রিং জাতীয় ঘটনা আপেক্ষিকতার
আলোয় এখন পরিষ্কার। এক কোয়াসার রয়েসে ৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে, তার আলো সোজা ছুটে
আসছে পৃথিবীর দিকে। মাঝে ৪০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে এক বাধা আস্ত এক গ্যালাক্সি পথজুড়ে
রয়েছে। আলো এতে থমকে যায় না, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ইঙ্গিতেই যেন অতি ভারী
গ্যালাক্সিটি আলোকে বাঁকিয়ে দেয়, গ্যালাক্সির মহাকর্ষ প্রভাবে আলো ঘুরপথে পৌঁছায় পৃথিবীতে। মাঝের
গ্যালাক্সি লেন্সের মত কোয়াসারের অনেকগুলো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। এরকম নৈসর্গিক ঘটনা মহাকর্ষীয়
লেন্সিং। লেন্সিং গ্যালাক্সি ঘিরে যে চারটি প্রতিবিম্ব তৈরী হয়, তা অনেকটা ক্রসের মত দেখতে। এটি
"আইনস্টাইনের ক্রস" নামে খ্যাত।

নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু গভীর এক রহস্যে ঢাকা। ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্রনিয়াম চন্দ্রশেখরকে ভাবিয়ে তুলতো
এসব। বিলেত যাবার পথে সমুদ্রে থাকতে হয়েছিল তাঁকে দিনের পর দিন। খোলা আকাশে, তারাদের
দেশে মন তাঁর উধাও হয়ে যেত, সেখানে প্রতিপলে কত তারা জন্মায়, কত তারা মরণ-যাতনায় ছটফটায়।
ভাবতেন, কোন্ আশ্চর্য নিয়মে প্রকৃতি এদের নিয়ন্ত্রণ করে ? ১৯২৮ সালে, ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার
আর্থার এডিংটনের কাছে পড়তে যান চন্দ্রশেখর। নক্ষত্রের জীবনচক্র বুঝতে, প্রথমে তার সৃষ্টির কথা জানা
দরকার। হাইড্রোজেন জাতীয় অনেক গ্যাস মহাকর্ষীয় আকর্ষণে এক জায়গায় জড়ো হয়ে সংকুচিত হয়,
ছোট্ট জায়গায় গ্যাস পরমাণুগুলো নিজেদের মধ্যে ঘনঘন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, তাদের গতিও অনেক
বেড়ে যায়। ফলে পুরো গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষে উত্তাপ এত বেড়ে যায় যে, হাইড্রোজেন পরমাণুরা
একে অন্যকে ধাক্কা মারে বটে, তবে তারা আর পরস্পর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় না, বরং একে অন্যের
সাথে জুড়ে যায় এবং হিলিয়াম তৈরি করে। এরকম "Fusion" এ কিছুটা ভর তাপে বদলে যায়। এইভাবে
মিলন-তাপে নক্ষত্র ঝলমলিয়ে ওঠে, অতিরিক্ত তাপে গ্যাসের চাপও বাড়তে থাকে। এতক্ষণ গ্যাস
মহাকর্ষের কবলে পড়ে সংকুচিত হচ্ছিল এবার ভেতরের চাপে মহাকর্ষ পিছু হঠতে থাকে। এক সময়
গ্যাসের চাপ আর মহাকর্ষের টান সক্ষমতা পায়। গ্যাসের সংকোচন বন্ধ হয়, নক্ষত্রটি লক্ষ লক্ষ বছর
অবিরাম আলো ছড়িয়ে যায়। মহাকর্ষ আর চাপের চাপান-উতোরে নক্ষত্রটি ততক্ষণ অবিচলিত থাকে।
যতক্ষণ নিউক্লীয় সংযোজন অব্যাহত থাকে-সংযোজনের বিপুল তাপ চাপ তৈরি করে মহাকর্ষের সর্বনাশা
টানকে ঠেকিয়ে রাখে। অবশ্য এর জন্য ভাঁড়ারে পর্যাপ্ত জ্বালানি থাকা দরকার! একদিন নক্ষত্রটির
হাইড্রোজেন ও অন্যান্য নিউক্লীয় জ্বালানি ফুরিয়ে যায়, নক্ষত্রটির জীবনে দুর্দিন আসে। রসদ ফুরোলে,
নিউক্লীয় সংযোজন বন্ধ হয়ে যায়, চুল্লী ঠান্ডা হতে থাকে। ফলে তাপের অভাবে চাপও তৈরী হয় না,
মহাকর্ষের টানকে আর ঠেকিয়েও রাখা যায় না; নক্ষত্রটি সংকোচনের কবলে পড়ে ছোট হতে থাকে।

এরপর নক্ষত্রটির ভাগ্যে কি ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে, তার স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না ১৯২০ সালের আগে।

চন্দ্রশেখর ধারণা করলেন : নক্ষত্র সংকুচিত হতে থাকলে, বস্তু কণার খুব কাছাকছি এসে যায়। পাউলির "অপবর্জন নীতি" বলে, খুব কাছাকাছি এলে, কণারা ভিন্ন গতিতে ছোটে। এতে কণারা আবার একে অন্যের থেকে দূরে ছিটকে যেতে চায়, এই সুযোগে নক্ষত্রটি আর একবার বাড়তে থাকে। কণাগুলোর দূরে সরে যাওয়ার ঝোঁকই "অপবর্জনের বিকর্ষণ"। এই বিকর্ষণ ও মহাকর্ষ টানের মধ্যে বোঝাপড়ার একটি নক্ষত্র নিজেকে একই অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে পারে. ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে নক্ষত্র জীবনের প্রথম অবস্থায়, যখন মহাকর্ষীয় টান ও তাপীয় চাপের মধ্যে ভারসাম্য থাকে। চন্দ্রশেখর এও বুঝতে পারলেন, "অপবর্জন নীতি" থেকে কুড়িয়ে পাওয়া বিকর্ষণ একটা সীমার মধ্যেই মহাকর্ষের টানকে ঠেকা দিতে পারে। কারণ, (নক্ষত্রের) বস্তুকণাদের মধ্যে যে গতির ফারাক, আপেক্ষিকতাবাদ তাকে আলোর গতির মধ্যেই সীমিত রাখে। এর অর্থ, নক্ষত্র ছোট হতে হতে যত ঘনই হোক, কণারা যত কাছাকাছিই আসুক, "অপবর্জন নীতির" বিকর্ষণ অভিকর্ষীয় টানের চেয়ে কম হয়। মাপ জোখ করে চন্দ্রশেখর দেখলেন, নক্ষত্র-ভর যদি সৌর-ভরের দেড়গুণের বেশি হয়, তবে সেই নক্ষত্রটি নিজেকে মহাকর্ষের নির্মম নিষ্পেশন থেকে আর বাঁচাতে পারে না। এই ভর-ই "চন্দ্রশেখর সীমা"। এর নীটে যেসব নক্ষত্রের ভর, তারা সংকোচনের হাত থেকে রেহাই পায় বটে, তবে এদরে বাকী জীবন কাটে "শ্বেতবাপন" বা নিউট্রন নক্ষত্র" হয়ে।

'চন্দ্রশেখর সীমার' ওপরে যেসব নক্ষত্রের ভর, তদের ধ্বংস কেউ আটকাতে পারে না, এমনকি "অবর্জনের" বিকর্ষণও না। ভেতরের তাপ ও চাপ এত দুর্বল যে মহাকর্ষের টানকে সামাল দিতে পারে না। অভিকর্ষীয় টান ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হয়ে ওঠে, দেশকালের বক্রতা অসীম হতে চায়। অর্থাৎ বস্তুকণাদের ভেতর ব্যবধান থাকে না, নক্ষত্রের আয়তন শূন্যে পৌঁছায়, সব মিলে একটা অসীম ঘন বিন্দুতে ঠাঁই পেতে চায়। প্রবল টানে আলো ভেতরের দিকে বেঁকে যায় যে, সে আর কোনদিন বেরিয়ে আসতে পারে না নক্ষত্র থেকে। আর যেখানে আলোই বন্দী, সেখান থেকে অন্যকিছু বেরিয়ে আসে কি করে ? কেননা, আপেক্ষিকতাবাদ তো কোন কিছুকেই আলোর সমান বা বেশি গতিতে ছুটতে দেয় না। তাহলে, আমরা পেলাম বেশ কিছু ঘটনা এবং স্থানকালের ঘটনাস্থল। এই ঘটনাস্থলের কোন কিছুই এসে পৌঁছায় না বাইরের কোন দর্শকের কাছে। এ অঞ্চলটি "কৃষ্ণবিবর" এবং এর সীমানা "ঘটনা-দিগন্ত"। "ঘটনা-দিগন্তের" ভেতরে কত ঘটনা ঘটছে, তার কোন হদিশ কিন্তু কোনদিন এসে পৌঁছায় না আমাদের কাছে। "কৃষ্ণ বিবরে" কোন গহ্বর নেই, এরা কালো বিন্দু মাত্র।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সালে রোজার পেনরোজ এবং স্টিফেন হকিংস্ দেখান – নক্ষত্রের সংকোচনে নক্ষত্রটি একসময় অসীম ঘন এক বিন্দুতে পৌঁছায়, যা নাকি sing বা নিরাকার বিন্দু। প্রতিটি "কৃষ্ণবিবরে" এরকম একটি Ularity আছে। এই বিন্দুতে, বস্তু আর বস্তু থাকে না, পরমাণু আর পরমাণু থাকে না; মহাকর্ষের কঠিন পেষণে দেশকাল ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়। পদার্থবিদ্যার নিয়মও এখানে খাটে না, কোন কিছুর পূর্বাভাস দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। মহাকর্ষ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছে, একে নিটোল এক কাঠামো দিয়েছে, জীবন-মৃত্যুর দোলায় দুলিয়েছে, নিয়মের বাঁধনে বেঁধে রেখেছে চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী নিয়ে সারা চরাচর। মহাকর্ষের এ এক চিরন্তন রূপ। আবার এই মহাকর্ষ-ই রচনা করেছে "কৃষ্ণ বিবরের" মত পৃথিবী, অসীম ঘনত্বের Sinngularity বিশ্বজনীন নিয়মগুলো সেখানে অচল। ঐ খেয়ালী দুনিয়ার হেয়ালী আমরা জেনে যাই-এটা বোধ হয় প্রকৃতি চায় না।

প্রকৃতিতে শক্তি রয়েছে অনেক, তারা কিন্তু একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। অর্কেষ্টার যে সুরে পরমাণু ও তার ভেতরের কণারা নাচে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, সে সুরের তাল, লয়, ছন্দ কিন্তু বেঁধে দেয় কোয়ান্টাম মেকানিক্স। যে নিয়ম-নিগাড়ে গাছ থেকে আপেল পড়ে, নক্ষত্র ঘিরে গ্রহ, গ্রহ ঘিরে উপগ্রহ ঘোরে, তার রাশ টেনে রেখেছে মহাকর্ষ। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড শাসনের মাপকাঠি দুটো; ছোট-র জগতের জন্য কোয়ান্টাম

মেকানিকস আর বড়-র জগতের জন্য মহাকর্ষ। মহাকর্ষ নিশ্চিত পরিণতির আশ্বাস : মহাশূন্যে কোন গ্রহের বর্তমান গতিবিধি জানা থাকলে, হাজার বছর পর সেটি কোথায় কিভাবে থাকবে সেটা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। অথচ পরমাণুর ভেতরের ছোট্ট জগতে এ ধরণের নিশ্চিত কোন আভাস নেই। আশ্চর্য যে কোয়ার্কল্যান্ড আশা নিরাশার দোলায় দোলে, সে জগতের অন্ধকার আনাচে কানাচে থাবা উচিয়ে বসে আছে সংশয়, অবিশ্বাস আর রহস্য; পরমুহূর্তে কি ঘটবে তার কোন ঠিক থাকে না, সবই যেন দৈবের অধীন। কোয়ান্টামের সূক্ষ্ম সে জগতে মাপজোখের যন্ত্রটি পর্যন্ত "সম্ভাবনার" শিকার হয়ে পড়ে। সেজন্য একটা মুহূর্তে কোন একটা ইলেকট্রনের অবস্থান যদিও বা জানা যায়, পরের মুহূর্তে সেটি কোথায় থাকবে, কি গতি নিয়ে ছুটবে, তা জানার উপায় নেই। কেবল এটুকু বলা যেতে পারে, "কণাটি বোধহয় অমুক জায়গায় আছে।"

প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল, তাই পরমাণুর খুদে জগতে কোয়ান্টাম নিয়মে শুধুই অস্থিরতা, অথচ সারা ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে মহাকর্ষের আশ্বাস আর অস্তিত্বের বিশ্বাস। এটি প্রকৃতির ছল ? এক সময় তড়িৎ আর চুম্বকত্বকে প্রকৃতির ভিন্ন দুটো শক্তি ভেবে মানুষকে ল্যাজে গোবরে হতে হয়েছিল। কোয়ান্টাম মেকানিকস, মহাকর্ষও কি সেরকম চিত্তবিভ্রম ? প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন ঃ কোয়ান্টাম ও মহাকর্ষের নিয়ম আদতে সুদুর প্রসারী এক নীতির ভিন্ন দুই রূপ। আইনস্টাইনের বিশ্বাস; কোয়ান্টাম এবং মহাকর্ষকে যদি মদনের শরে প্রেমবন্ধনে বাঁধা যায়, ওরা হবে হরিহর আত্মা, ওদের মিলনে জন্ম নেবে "কোয়ান্টাম-গ্র্যাভিটি"। তাঁর যুক্তি : তড়িৎ আর চুম্বকত্বের বৈবাহিক সম্পর্কের ফসলই-ই তো "তড়িৎচুম্বকত্ব"। তবে সব বিবাহ-ব্যবস্থায় যেমন, দুটো নিয়ম এক করে যে নিয়ম, তাতেও তেমনি কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের লড়াই তো থাকবেই।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো মানুষের জীবনধারণে বেশ কিছুটা বাড়তি সুযোগসুবিধা আর স্বস্তি এনেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে একটা "সম্পূর্ণ সময়ন তত্ত্ব" এর নাগাল পেলে মানুষ "সব পেয়েছির দেশে" পৌঁছে যাবে–এমন ভাবার কারণ নেই। তবে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানুষ অজানাকে জানতে চেয়েছে, ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে অব্যাখ্যাত রহস্য, প্রকৃতির মূল সুরটি ঠাহর করতে চেয়েছে। কারণ, মানুষ শুধু ইট-কাঠ-কংক্রিটের জঙ্গলে, নানা ভোগ-বিলাসে তৃপ্ত নয়, সে চায় নিজেকে জানতে : "আমি কে, এখানে কেন, এসেছি কোত্থেকে, আর যাবই বা কোথায়? "উত্তর মেলেনি এখনও, তাই অন্বেষণ অব্যাহত। প্রকৃতি ঘিরে কত রহস্য, অস্তিত্ব জড়িয়ে কত আড়াল-আবডালে! মানুষ তাই ছুটে চলেছে পরম সেই সত্যের লক্ষ্যে অমৃতের সন্ধানে।

সৌমেন সাহা
৫২, হাজী মেহের আলী রোড
খুলনা
ই-মেইল ঃ sahasoumen024@gmail.com

কৃষি ও তথ্য বিপ্লব

বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে জগতে আজ মহাজাগরণের মহোৎসব চলছে। হাইটেকের এই মানুষ গ্লোবাল ভিলেজ থেকে গ্লোবাল ফ্যামিলিতে পরিণত হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আদি চিন্তা চেতনা ও আবিষ্কার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নতুন পদ্ধতি ও কলাকৌশল মানুষকে প্রবাহিত করে চলেছে। প্রাচীনকালে মানুষ বনের হিংস্র প্রাণী এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ, ভয়-ভীতি থেকে বাঁচার জন্য যখন প্রকৃতির কাছে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে প্রকৃতির বৈরী পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে। এই মানুষ বন্য পশুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং শিকার করার জন্য পাথরের হাতিয়ার তৈরী করেছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং ভয়-ভীতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গুহার ভিতর বসবাস করেছে। গুহাবসী মানুষ তার চিন্তা দ্বারা ঘরবাড়ী বানাতে শিখেছে। কিন্তু পাতার ছাউনির মাটির ও কাঠের তৈরী ঘরবাড়ী জলোচ্ছাস এবং ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। বারবার ঘর বেঁধে যখন নিরাশ হয়েছে তখন শক্তভাবে ঘর তৈরী করার মনস্থির করেছে। পাথর দিয়ে, মাটি পুড়িয়ে, শক্ত করে কাঠ চিলে গৃহ নির্মাণ করতে শিখেছে। এই নির্মানশৈলী ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছেছে। মানুষের আগুন আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনা। এই আগুনের তাপ দ্বারা ধাতু গলাতে শেখা এবং চাকা তৈরী করা সভ্যতার চাকাকে যে সামনের দিকে চালিয়েছে যার কারণে পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার, কাগজ তৈরী করে তথ্য জগতে বিপ্লব সাধন করেছে। আদিম মানুষ স্বপ্ন দেখতো পাখির মত আকাশে উড়তে, মাছের মত সাঁতার কাটতে। সে তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য আজ আবিষ্কার করেছে যন্ত্র, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, ডিজেল ইঞ্জিন, বাষ্প চালিত ইঞ্জিন যা তার গতিকে বৃদ্ধি করেছে। কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি করেছে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে অসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানুষ একে একে আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে বিশ্ব বিবেককে। এই বিজ্ঞান ব্যবহার হচ্ছে চিকিৎসায়, শিক্ষায়, গবেষণায়, কৃষিতে, শিল্পে সর্বোপরি সভ্যতায়।

কৃষি তথ্য জগতের একটি অংশ, এটা বুঝতে হলে আমাদের কৃষির ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিকে একটু নজর দিতে হবে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে একজন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক যে কয়জন মানুষের জন্য খাদ্য এবং সূতা উৎপাদন করত এখন প্রত্যেক কৃষক তার প্রায় ১৫ গুণ বেশি উৎপাদন করে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে খামারের মোট জমির পরিমাণ ১.২ বিলিয়ন একরে পৌঁছেছিল। ১৯৩০ সালে খামারের সংখ্যা প্রায় ৬.৮ মিলিয়ন ছিল। বর্তমানে প্রায় ২ মিলিয়ন খামারে ১ বিলিয়ন একর জমির কাছাকাছি জমিতে চাষাবাদ করা হয়। অল্প সংখ্যক খামার, অল্প সংখ্যক শ্রমিক ব্যবহার করে জনপ্রতি অনেক খাদ্য উৎপাদান করছে যা পূর্বে কখনও ছিল না। কতিপয় শিল্পের মধ্যে কৃষি একটি শিল্প যেখানে উৎপাদনের পর প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যোগান এবং চাহিদা অনুসারে মূল্য নির্ধারণ হয়। অন্যদিকে উৎপাদনকারী বাজারে মজুত রাখে যাতে পূর্ণপ্রতিযোগিতার সময় একবারে বিক্রি বন্ধ না হয়ে যায়। মুক্ত বাজারে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যের উপর এর গুণগতমান নির্ণয় করা হয় এবং খরচ অপূর্ণপ্রতিযোগিতার অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই অবস্থায় খরচের উপর মূল্য নির্ভর করে যেখানে খরচের দাম দ্রুত বাড়তে পারে না। এভাবে কৃষিকে ব্যবসা হিসেবে টিকতে হলে প্রত্যেকটি কাজকে আরও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। দক্ষতা এবং উৎপাদনে কম খরচ, নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্ভব। ১৯৮০ দশকের মাঝের দিকে এই দক্ষতা শুধু শ্রমিক কমিয়ে আনার কৌশলের উপরও গড়ে উঠেছিল।

আজকের দিনের কৃষি উৎপাদনকারীকে ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে শস্য জন্মান, রোগ প্রতিরোধ, সার প্রয়োগ, কীটনাশক এবং আগাছা দমনের উপর যথাসম্ভব ভাল তথ্যভিত্তিক জ্ঞান থাকতে হবে। তাছাড়া

উৎপাদনকারীকে শস্য আহরণের পূর্বে অনিশ্চিত বিক্রয়যোগ্য পণ্যকে বাজারজাতকরণের সুপরিকল্পনাও থাকতে হবে . বহু উপযুক্ত তথ্য নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য একজন কৃষকের মাইক্রোপ্রসেসর প্রযুক্তি প্রয়োজন যেখানে বিশেষ চালনার মাধ্যমে অনেকগুলো ডাটা নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করা যাবে। কতিপয় উদাহরণ ব্যাখ্যা করা হল :

- ৯৮০ ফারেনহাইটের উপরে মোরগ-মুরগী অথবা পাখিদের বেঁচে থাকা কষ্টকর। গরম ঋতুতে পাখিদের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর শীতল ঘর দিতে হবে অন্যথায় তারা হিট স্ট্রোকে মারা যাবে। প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তি সময় দিয়ে থাকে।
- কিছু কিছু শস্য সফলভাবে আহরণের ক্ষেত্রে শুষ্ক অবস্থা অতি প্রয়োজনীয়। খড় কাটার পর তিনদিন শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন নতুবা এগুলো মাঠে পচে যাবে। এখানে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রয়োজন।
- আবহাওয়ার অবস্থার উপর পোকা-মাকড়ের জন্মানো অথবা মরা নির্ভর করে। কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে সঠিক সময়ে শস্যের জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া দেখে উৎপাদনকারী বুঝতে পারে কখন ঔষধ ছিটাতে হবে। কিছু ছিটানো ঔষধ আছে যেগুলোর এক বা দুই দিন কার্যকারিতা থাকে।
- পশুখাদ্য ব্যবসায় মুনাফা ব্যাপকভাবে নির্ভর করে পশুর মূল্য এবং খাদ্যের মূল্যের সম্পর্কের উপর। বাস্তবিকই পশুখাদ্য দাতাদের এই সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং দিনের পর দিন সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যেখানে গো-খাদ্যের উপাদান সহজে পাওয়া যায়, খাদ্য দাতার কাজ হবে সমস্ত মূল্য একত্রিত করে পশুর মূল্যের তথ্যের সাথে যুক্ত করা এবং দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা। পশু খাদ্যের উপাদানের সংখ্যা যদি অধিক হয় তখন সেটা দারুণ জটিল আকার ধারণ করে। এ ধরনের ডাটা বিশ্লেষণ করার জন্য মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি খাদ্য দাতার সুবিধাজনক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সুবিধাজনক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত আশা করতে হলে উৎপাদনকারীকে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য অবশ্যই থাকতে হবে। এটি ক্রম উন্নতির ধাপ, পরিচালনার রেকর্ড রাখার সাথে জড়িত শস্য এবং পশুর রেকর্ড রাখাই শেষ নয়। উৎপাদনের খরচের কাঠামো এবং বিনিয়োগও রাখতে হয়। এই তথ্য ব্যাপক আকারের হতে পারে। মাইক্রোপ্রসেসর প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শহিদুল ইসলাম
প্রাবন্ধিক, প্রভাষক
ইস্পাহানী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
রামেরকান্দা, রোহিতপুর
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ঃ টেকসই উন্নয়নের নিয়ামক

ভূমিকা : মানব জাতি ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অশিক্ষা দিনে দিনে তীব্র হচ্ছে। ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। যে পরিবেশ-ব্যবস্থার উপর আমাদের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল, তার অবক্ষয় হচ্ছে। নিজেদের ভবিষ্যতকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধিশালী করতে হলে আমাদের পরিবেশ ও উন্নয়নের বিষয়গুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। পূরণ করতে হবে মানুষের মৌলিক চাহিদা। জীবনের মানকে উন্নত ও পরিবেশ ব্যবস্থাকে আরো ভালভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে হবে। পরিবেশের কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই এবং কোন দেশই আলাদাভাবে নিজ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটিয়ে এককভাবে নিজের ভবিষ্যতকে শঙ্কামুক্ত করতে পারে না। তবে সকল দেশ যদি অংশীদারিত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বব্যাপী একযোগে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে, তাহলে সারা পৃথিবীর পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক নীতিমালা : পরিবেশ উন্নয়ন ধারণায় বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা হারিয়ে না ফেলে তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে কিছু নীতিমালা থাকা আবশ্যক। যেমন -

- উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে মানুষ। প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারা স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনশীল জীবনের দাবীদার এবং তা পূরণ করা জাতীয় সরকারের অঙ্গীকার;
- বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের পরিবেশগত ও উন্নয়ন সংক্রান্ত চাহিদা ন্যায়সঙ্গতভাবে মেটানোর জন্য উন্নয়নের অঙ্গীকার পূরণ করা জরুরী;
- পরিবেশ সংরক্ষণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গরূপেই বিবেচনা করতে হবে;
- শান্তি, উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ এই বিষয়গুলো অবিভাজ্য এবং পরস্পর নির্ভরশীল;
- যেকোন দেশের সরকারকে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে;
- যারা দূষণ বা অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যার শিকার তাদের ক্ষতির পরিমাণ এবং এ সংক্রান্ত দায় নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কার্যকরি ব্যবস্থার পক্ষে যে আইন তা মানতে বাধ্য করতে হবে;
- সকলের জন্য উত্তম ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে যুব সমাজের সৃজনশীল, আদর্শ ও সাহসকে এক করে অংশীদারিত্বের ভিত্তি রচনা করতে হবে;
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা থাকবে। টেকসই উন্নয়ন অর্জনের প্রচেষ্টায় তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ রাখা জরুরী।

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ ও তার প্রভাব : ইতিমধ্যে বিশ্বের সকল দেশে পরিবেশ সংরক্ষণের আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু পরিবেশের অবক্ষয় ঠেকানো যায়নি। সময়ের সাথে সাথে বরং পরিবেশের অবক্ষয় তীব্র আকার ধারণ করছে। নিম্নে পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণ ও তার প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হলো ঃ

- **দারিদ্র :** দারিদ্র একটি জটিল ও বহুজাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। সম্পদের স্থায়িত্ব ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে তার পরিধি বেড়ে যায়। দারিদ্র পরিবেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অপরদিকে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ভোগ ও উৎপাদন কোনটিই টেকসই নয়। এসব দেশে জনসাধারণের চাহিদা বেশি। তাদের জীবনাচরণ টেকসই নয় বলে সেসব দেশে বর্জ্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে সারা বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে।
- **জনসংখ্যা :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও কারণগুলোর সাথে টেকসই উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার পাশাপাশি অটেকসই উৎপাদন ও ভোগের কারণে পৃথিবীর জীবনদায়ী

ব্যবস্থার ওপর অত্যাধিক চাপ পড়ছে। মাটি, পানি, বায়ু ও জ্বালানী এবং অন্যান্য সম্পদ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়ায় পরিবেশগত স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, অসহায় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা, শহরে স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসন এবং পরিবেশ দূষণ ও বিপত্তিজনক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে হিমশিম খেতে হচ্ছে জনসংখ্যার চাপ বাড়ার কারণে সারা বিশ্বের অরণ্য আজ হুমকির সম্মুখীন। অরণ্য বিনাশের ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়, হ্রাস পায় জীববৈচিত্র ও পশুপাখির আবাসস্থল। অন্যদিকে গ্রীন হাউস গ্যাস বাড়ার কারণে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে মানবজাতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর।

- **গ্রীণ হাউস প্রতিক্রিয়া :** বায়ুমণ্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাসের আধিক্যের কারণে ভবিষ্যতে ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা তীব্র আকারে বেড়ে যাবে। যারপর নাই সমুদ্র স্ফীতি ও অন্যান্য সম্ভাব্য আবহাওয়া বিপর্যয়ের কারণে বিপন্ন হয়ে পড়বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-দেশ, উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল। বন্যা, খরা ও মরুকরণ দেখা দিবে অহরহ। ফলশ্রুতিতে -
  - উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত প্রায় দু'কোটি মানুষ বাস্তুহারা হবে;
  - দেশের নিচু এলাকাগুলো প্লাবিত হবে;
  - স্বাদুপানি এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে ফসলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে।
- **সমুদ্র ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা :** সমুদ্র দূষণের শতকরা ৭০ ভাগ আসে ভূ-ভাগ থেকে, যার উৎস হিসেবে শহর-বন্দর, কল-কারখানা, কৃষি, নির্মাণ, বন, পর্যটন ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। পয়ঃবর্জ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, পানি, আবর্জনা, ধাতব দ্রব্য, পারমাণবিক বর্জ্য, তৈল প্রভৃতি সামুদ্রিক পরিবেশকে সবচেয়ে বেশি দূষিত করে যা সমুদ্র জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে বড় বিপর্যস্ত পরিবেশ।
- **বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার :** পৃথিবীর কিছু কিছু এলাকা রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা এতটা দূষিত যে, তার ফলে মানব স্বাস্থ্য, জেনেটিক কাঠামো ও প্রজনন ব্যবস্থার ক্ষতি হচ্ছে। এর পাশাপাশি দীর্ঘ স্থায়ী দূষণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়ার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে।
- **কঠিন বর্জ্য ও পয়ঃব্যবস্থাপনা :** নগরে কঠিন ও তরল পয়ঃবর্জ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিবছর বিশ্বে কমপক্ষে ৫২ লক্ষ লোক (যার মধ্যে ৪০ লক্ষ শিশু) কঠিন ও তরল পয়ঃবর্জ্যের যথাযথ অপসারণের অভাব থেকে সৃষ্ট রোগে মারা যায়।
- **খরা ও মরুকরণ :** মরুকরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিঘাত লক্ষ্য করা যায় চারণ ভূমির অবক্ষয়ের মধ্যে। খরা ও মরুকরণের কারণে দরিদ্র ও ভুখা লোকের সংখ্যা বাড়ে। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি উপসাগরীয় আফ্রিকায় খরার কারণে ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। মরুকরণ সমস্যাটি বিশাল। ইতমধ্যে বিশ্বের শুষ্ক ভূমির ৭০ শতাংশ প্রায় ৩৬০ কোটি হেক্টর হয়ে পড়েছে মরু কবলিত।

পরিবেশ উন্নয়নে কৌশলনীতি : পরিবেশ ও উন্নয়ন এর স্বার্থক বাস্তবায়ন জাতীয় সরকারেরই দায়িত্ব। জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। সেইসাথে আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও প্রয়োজন আছে। নিম্নে পরিবেশ ও উন্নয়নের কৌশলসমূহ আলোচনা করা গেল :

- জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ ও উন্নয়নের বিষয়কে জনসংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত করার তাৎপর্য রয়েছে। একটি জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ও ভোগের ধরণ, জীবনচর্চা এবং স্থায়িত্ব তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং পরিবেশের সমস্যা ও জনসংখ্যা এ বিষয় দু'টিকে সামগ্রিক উন্নয়ন কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, উন্নত খাদ্য, জীবনমান, নারীর আয় ও মর্যাদা বৃদ্ধিসহ ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যায়;

- প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং জীবন ও পরিবেশের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে;
- সকল দেশকে তার মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা মনে রেখে কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা, ন্যূনতম বাসস্থানের সুযোগ, শিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য, বনায়ন, প্রাথমিক পরিবেশ সেবা ও মহিলাদের চাকুরীর সুযোগসহ নৈতিক সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে;
- পরিবেশ থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য বিপত্তি চিহ্নিতকরণ ও ঝুঁকি কমানোর জন্য সকল দেশের নিজস্ব কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করে নিতে হবে এবং জনগণকে দূষিত পরিবেশ থেকে উদ্ভূত স্বাস্থ্য বিপত্তি মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে;
- জাতীয়ভাবে জ্বালানীর দক্ষতা বৃদ্ধি করে দূষণ নির্গমনের মাত্রা নির্ধারণ করতে পরিবেশসম্মত জ্বালানীর ব্যাপারে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে;
- পরিবেশ ব্যবস্থার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা এবং মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বন সংরক্ষণ ও বনায়নের দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করতে ব্যবসায়ী, এনজিও, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, স্থানীয় সম্প্রদায়, স্থানীয় সরকার ও জনগণের সাথে সমন্বয় করতে হবে;
- যেসকল দূষক ও গ্রীণ হাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে সেগুলোর মাত্রা সম্পর্কে আমাদের সঠিক জানতে হবে এবং সবাইকে দক্ষ ও কম দূষণকারী জ্বালানী ব্যাবহারে উৎসাহ দিতে হবে;
- মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ, উন্নত মানের জীবনমাত্রা এবং শিক্ষা ও কর্মের সুযোগসহ একটি নিশ্চিত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাখতে হবে;
- শিশুদের স্বাস্থ্য, পর্যাপ্ত খাবার, শিক্ষা ও দূষণ এবং বিষাক্ত দ্রব্যাদি থেকে সুরক্ষা বিষয়ে সরকারকে সজাগ থাকতে হবে;
- জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন, বিশেষত অর্থনৈতিক সাফল্য-ব্যর্থতা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে টেকসই উন্নয়ন সূচক ব্যবহারে সহজতর করতে হবে। উক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য চলমান টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম নজরদারির কাজে ব্যবহার করতে হবে।

পরিবেশ উন্নয়নে যাদের ভূমিকা :

বিজ্ঞান : মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে ভবিষ্যতে মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য উন্নয়ন ও পরিবেশের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন, সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং পরিবেশের অবক্ষয় সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সচেতন;

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ : বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা অধিকতর সংলাপের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাছাড়াও জীব জগতের সুরক্ষায় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বারোপ করে আচরণবিধি ও অনুসরণিকা প্রণয়ন করে থাকেন;

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ : স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন - পৌর সরকার পৌর এলাকায় সড়ক নির্মাণ, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ ছাড়াও নগর পরিকল্পনা তথা গৃহায়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহায়তা করে থাকেন;

টেকসই উন্নয়নে যুবক : বিশ্বের মোট এক-তৃতীয়াংশ যুবক নিজস্ব ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তারা তাদের ভূমিকা চায় এবং পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্তকরণ চায়;

টেকসই উন্নয়নে নারী : প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে;

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা : মানুষের কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সে বিষয়ে আমরা এখনও অবহিত নই। পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে অধিকতর সংবেদনশীল ও সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরী। টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও নৈতিক সচেতনতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও আচরণ ইত্যাদি শিক্ষা মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

সুপারিশ : আমরা সকলেই পরিবেশ সমস্যা সম্পর্কে কোন না কোনরূপ চিন্তাশীল এবং চিন্তা চেতনায় এর উপাদানগুলো সর্বদাই উপস্থিত। তাই বর্তমান সময়ের পরিবেশ সমস্যার প্রেক্ষাপট ও তার সমাধানের ইঙ্গিতস্বরূপ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো –

- সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে শিক্ষা, জনসচেতনতা কার্যক্রম ও অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে টেকসই জীবনযাত্রার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন, পরিবেশসম্মত প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবাদান ইত্যাদির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ;
- জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে পরিবেশ ও উন্নয়নকে সম্পৃক্ত করতে হবে;
- পরিবেশ ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনা ও মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য দেশে বন সংরক্ষণ ও বনায়নের জরুরী প্রয়োজন;
- জীব প্রযুক্তি কর্মসূচীর সাফল্য অধিক প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের ওপর নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে যাতে বিদেশে মেধা পাচার হতে না পারে তার জন্য নিজ দেশে উচ্চতর প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করতে হবে।

উপসংহার : পরিবেশ অবক্ষয় সম্পর্কে আমরা মোটামুটি অবহিত হলেও তার মাত্রা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা আমাদের নেই। পরিবেশ সমস্যাগুলো বহুমাত্রিক এবং অনেকগুলোর একই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাত্রা আছে। জাতীয় পর্যায়ে একটি দেশ যত তৎপরই হউক না কেন, শেষ পর্যন্ত অনেক সমস্যা সমাধানের জন্য তাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতেই হয়। এ কারণে পরিবেশ সঙ্কট আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও গতিময় করেছে। আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ডকে কিভাবে টেকসই করা যাবে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিবেশ বিপর্যয়কে ঠেকানোর জন্য গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক : জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ, কৌশল প্রণয়ন ও পরিবেশের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বর্তমান আছে। বলতে গেলে পরিবেশ চেতনা মানুষের মধ্যে একটি দায়বোধ জন্ম দেয়। মানুষকে করে তোলে দায়িত্বশীল। সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনাচরণকে টেকসই করার মাধ্যমেই পরিবেশের সঙ্কট কাটতে পারে। তাই পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে টেকসই উন্নয়নের দিকে আমাদের জীবনাচরণ ও চিন্তা-ভাবনাকে পরিচালিত করার অঙ্গীকার থাকবে এটাই প্রত্যাশা।

মো: সিরাজুল ইসলাম
সিনিয়র শিক্ষক
বুড়িচং কালী নারায়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
বুড়িচং, কুমিল্লা

আজব দূরবীক্ষণের মজার ইতিহাস

মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা দেখতে পারে, তার চেয়ে অতি ক্ষুদ্র বা তার চেয়ে বড় করে কোনকিছু দেখা যায় তা আগে মানুষ কল্পনাই করতে পারে নি। হাতের কাছে অতি ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস দেখার জন্য যেমন ইলেক্ট্রনীয় মাইক্রোস্কোপ রয়েছে, তেমনি দৃশ্যমান তারা ও মহাকাশের নক্ষত্র জগতের অসংখ্য বিস্ময় দেখার জন্য রয়েছে এক যন্ত্র, যার নাম দূরবীক্ষণ যন্ত্র। রহস্যময় এই মহাকাশের রহস্য উন্মোচনের জন্য জাদুকরী দূরবিনের আবিষ্কার করেছেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি।

তবে, দূরবীনের ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র গ্যালিলিও-ই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তা নয়। এর আগেও এর অস্তিত্ব ছিল। মজার ব্যাপার তা ছিল ছোটদের খেলনার মত। লিওপার্সী নামে হল্যাণ্ডের একজন চশমা বিক্রেতা ১৬০৮ সালে প্রথম এ জাতীয় একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি সরল টিনের চোঙের তলায় চশমার লেন্স বসিয়ে আবিষ্কার করেন এই যন্ত্রের। এই যন্ত্রের মধ্যে চোখ রাখলে দূরের জিনিস বড় দেখা যেত।

লিওপার্সী এই অভূতপূর্ব যন্ত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকলেও অজ্ঞাত ছিলেন না গ্যালিলিও। তিনি ১৬০৯ সালে জানতে পারেন এই মজার খেলনার কথা। তিনি জানতে পারলেন যে, একদল ছোট ছেলে কাচের লেন্স নিয়ে মজা করছে। যার সাহায্যে দূরের জিনিস বড় দেখা যায়। তিনি উৎসাহী হয়ে চোঙ সংগ্রহ করলেন এবং তার উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করলেন।

তিনিও পরে অনুরূপ একটি দূরবীন তৈরী করলেন কিন্তু নকশা লিওপার্সীর চোঙের থাকলেও এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেন দুটো লেন্স। এতেই দূরবীনের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। এরপর নবনির্মিত দূরবীনে চোখ রেখে 'থ' হয়ে যান। তিনি মহাকাশের এক অনন্য রূপ দেখতে পান। নক্ষত্র যা পৃথিবীর বুকে অতি ক্ষুদ্র আলোর কণা মনে হয় তা বাস্তবে কত বিশাল দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। তিনি তার বন্ধুদেরও দেখান মহাকাশের এই অপরূপ সৌন্দর্য, যা মানুষ আগে দেখবে বলে কল্পনাও করেনি।

তিনি প্রথম দেখতে পেলেন চাঁদের বুক মসৃণ নয়। এতে রয়েছে বড় পাহাড় এবং গর্ত। শনির চারপাশে আছে বলয়। বৃহস্পতির আছে তিনটি চাঁদ।

গ্যালিলিও তাঁর দূরবীনে যে লেন্স দুটি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলো ছিল উত্তল বহুমুখী লেন্স (Convex Objective Lense) এবং অবতল চক্ষু লেন্স (Concave Eye Piece)। এই দূরবীনকে গ্যালিলিও দূরবীন বলা হয়। এ ছাড়াও শক্তিশালী দূরবীন পরবর্তীতে তৈরী করা হয়, অবতল লেন্সের পরিবর্তে উত্তল চক্ষু লেন্স ব্যবহার করে, যার নাম কেপীলারীয় দূরবীন। এ ধরণের দূরবীন হলো প্রতিসরক দূরবীন। কারণ এতে আলো গ্রহণের জন্য লেন্স বা আতস কাচ ব্যবহার করা হয়। ১৯৬৮ সালে বিজ্ঞানী নিউটন সর্বপ্রথম প্রতিফলক দূরবীন তৈরী করেন - যার ব্যাস ছিল মাত্র ২.৫ সেন্টিমিটার।

আজকাল অনেক দেশে প্রতিফলক আলোক দূরবীনকে অবলম্বন করে তৈরী হয়েছে বেতার দূরবীন (Radio Telescope)। মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য দূরবীনের সাথে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার চলছে।

গোটা মহাকাশের দ্বার আজ খুলে গিয়েছে মানুষের চোখের সামনে। লিওপার্সী ও গ্যালিলিও এর হাতুড়ে দূরবীন আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে এক বিস্ময়। মানুষ যে মহাকাশ দেখে সৌন্দর্যে মুগ্ধ হত, আজ সেই মহাকাশের প্রতিটি বস্তুকণা দেখে তারা বিস্মিত।

তানহা ওয়াহিদ আদৃতা
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ), হলিক্রস কলেজ
তেজগাঁও, ঢাকা

ইন্টারনেট বিশ্ব যোগাযোগের সেতুবন্ধন

বিংশ শতাব্দী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের শতাব্দী। এ শতকেই মানুষ তার আপন প্রচেষ্টায় বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। এর অনন্য স্বাক্ষর ইন্টারনেট। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সাথে কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাকে ইন্টারনেট বলা হয়ে থাকে। ইন্টারনেটের বিস্ময়কর যাদুস্পর্শে আমরা আজ ঘরে বসেই সারা বিশ্বের সচিত্র ঘটনাপ্রবাহ শোনা, দেখা, খবরাখবর নেয়া ও তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছি। ইন্টারনেট হলো নেটওয়ার্কসমূহের নেটওয়ার্ক। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক সফলতার অপর নাম ইন্টারনেট। ইন্টারনেট হলো International Computer Network Service। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্তের কম্পিউটার থেকে অপর প্রান্তের আর একটি কম্পিউটারের সাহায্যে ছবিসহ যাবতীয় তথ্য দ্রুত সংগ্রহ ও প্রেরণ করা যায়। একটি মূল কম্পিউটারের সাথে অনেকগুলো টার্মিনাল যোগ করে একাধিক ব্যক্তি তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেটওয়ার্কের পর নেটওয়ার্ক পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে এক মহা যোগাযোগ নেটওয়ার্ক।

ইন্টারনেটের জন্ম ইতিহাস বেশি দূরের নয়। এইতো সেদিন, ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার করে। প্রতিরক্ষা বিভাগের কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা চারটি কম্পিউটারের মধ্যে গড়ে তোলে প্রথম অভ্যন্তরীণ এক নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ যোগাযোগ ব্যবস্থার নাম ছিল 'ডাপার্নেট'। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে ডাপার্নেটের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'আর্পানেট'। ক্রমশ চাহিদার ওপর নির্ভর করে ১৯৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন সর্বসাধারণের জন্য এরকম অন্য একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে। এর নাম রাখা হয় 'নেস্ফোনেট'। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে নেস্ফোনেট এর বিস্তার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে গড়ে ওঠে আরো অনেট ছোট মাঝারি নেটওয়ার্ক। ফলে এ ব্যবস্থাপনায় কিছুটা হলেও অরাজকতা দেখা দেয়।

এ অরাজকতা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রয়োজনেই গড়ে তোলা হয় 'কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক'। নব্বই এর দশেকের গোড়ায় এ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। বিশ্ববাসী পরিচয় লাভ করল ইন্টারনেট নামক এক বিস্ময়কর ধারণার সঙ্গে। ইন্টারনেট একটি বিশাল বিষয়। একটি Software এর পক্ষে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটির সার্ভিসের জন্য পৃথকভাবে একটি করে Software প্রয়োজন। Software এর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে এমন কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত IP (Internet Protocol) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

- Telenet (Telephone Network) : একটি কম্পিউটার যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপর কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত হয় এর মাধ্যমে তা ব্যবহার করা হয়। এর জন্য একটি Password প্রয়োজন হয়।
- FTP Session (File Transfer Protocol) : এ Protocol এর মাধ্যমে একটি কম্পিউটার থেকে আরেকটি কম্পিউটারের মধ্যে ফাইল আদান-প্রদান করা যায়।
- IRC (Internet Relay Chat) : এর মাধ্যমে অসংখ্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারী একই সাথে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে পারে।
- E-mail (Electronic Mail) : এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর যেকোন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সাথে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
- Copies : Copies-এর মাধ্যমে খুব সহজে ফাইল কপি করা যায়। কম্পিউটারের জন্য আলাদা Supporting Software থাকতে হয়।

- WWW (World Wide Web) : এটি একটি জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত Protocol-I । এখানে তথ্যগুলো Multimedia এর মাধ্যমে একই সময় চিত্র ও শব্দ সহকারে পাওয়া যায় । তবে এর জন্য পৃথক Software প্রয়োজন হয় ।
- Net News : এ Protocol এর মাধ্যমে অতি সহজে News Group গুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা যায় । সাংবাদিকরা এ ইন্টারনেটের মূল ব্যবহারকারী ।

কম্পিউটারের সাহায্যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতিকে Protocol বলে । দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে নির্দিষ্ট Protocol না থাকলে পারস্পরিক যোগাযোগ সম্ভব হয় না । অনেকগুলো Protocol এর মধ্যে ICP/IP সবচেয়ে পুরাতন এবং দক্ষ Protocol হিসেবে পরিচিত । অনেক বড় আকারের ফাইল এ Protocol এর মাধ্যমে সহজেই আদান-প্রদান করা যায় । ইন্টারনেট কোন কোম্পানি নয় । এটা আন্তর্জাতিকভাবে সব্যর । তবে এর নিয়মাবলী ও কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য তিনটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে । এদের নাম হল :

- Internet Network Center বা INIC : এরা ডোমেইন নাম (a.v) রেজিস্ট্রি করে;
- Internet Society : ইন্টারনেট প্রটোকলের মান কি হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে;
- World Wide Web Consortium : ভবিষ্যতে ওয়েব প্রোগ্রামিং এর ভাষা কি হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আলোচনা করে ।

কোন দেশে যদি ইন্টারনেটের সার্ভার থাকে তবে এ সার্ভারের সাহায্যে দুনিয়ার যেকোন প্রান্তে রাখা অপর সার্ভারে যোগাযোগ করা যায় । এক ব্যবহারকারীর সাথে অপর ব্যাবহারকারীর এ যোগাযোগ লাইনকে বলা হয় অন লাইন । কিন্তু সার্ভারবিহীন দেশের ক্ষেত্রে অপর দেশে সার্ভারে প্রথমে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হয় । একে বলা হয় অফ লাইন । অফ লাইন বেশ ব্যয়বহুল । এমনকি সময় বেশি লাগে ।

বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেটের আজ জয় জয়কার অবস্থা । এ সুযোগ গ্রহণে বাংলাদেশও কার্পন্য করেনি । তাইতো ১১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয় । বর্তমানে অন লাইন অফ লাইন ইন্টারনেট সার্ভিসের বিশাল জগতে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে । ইতোমধ্যে টি এণ্ড টি বোর্ড রয়টার, ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাঙ্ক মিশন, সাইটেক, আই এস এন ও বেক্সিমকোসহ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে ভিস্যাট বসানোর অনুমতি দিয়েছে । এ ছাড়াও অদূর ভবিষ্যতে সরাসরি রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেটের গুরুত্ব অপরিসীম । মানব জীবনের এমন কোন স্তর নেই যেখানে ইন্টারনেটের ছোঁয়া লাগেনি । বর্তমান বিশ্বে ইন্টানেটের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য । যোগাযোগের ইতিহাসে ইন্টারনেট নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে । সুদূর আমেরিকাতে চিঠি পাঠাতে খরচ হয় ২০-২৫ টাকা । আর সময়তো কমপক্ষে দুই সপ্তাহ । অথচ ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-মেইল পাঠাতে লাগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড । খরচ লাগবে .৫০ পয়সা থেকে ২.৫০ টাকা । বাংলাদেশের একজন মানুষ ঘরে বসেই লন্ডনের যেকোন লাইব্রেরীতে পড়ালেখা করতে পারবে । ক্যাটালগ দেখে ইচ্ছেমত বই বাছাই করা যায় । এমনকি প্রয়োজনীয় কয়েক পৃষ্ঠা প্রিন্ট করেও নেয়া যায় । বিশ্বের যেকোন দেশের মানুষ অন্য যেকোন দেশের পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়তে চাইলে ইন্টারনেটের সাহায্যে তা কম্পিউটারের পর্দায় পড়া যাবে । চাকরির বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও ইন্টারনেটের অবদান অতুলনীয় । বিজ্ঞাপন দেখে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা যায় । পাঠানো যায় নিজের বায়োডাটা । এ ছাড়াও ইন্টারনেটের সাহায্যে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ করা যায় । বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, প্রবাসী অথবা বিশ্বের যেকোন দেশে শপিং করা থেকে শুরু করে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিনোদন ইত্যাদি সব কিছুই ইন্টারনেটের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে । তাছাড়া

আইনগত সহায়তার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিখ্যাত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব। যারা ভ্রমণপ্রিয় তারা দেশে বসে ভ্রমণ ইচ্ছুক দেশের আবহাওয়া জানা, হোটেল বুকিং, প্লেনের টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। এর ফলে শ্রম, সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে।

আলোর বিপরীতে অন্ধকার, ভালোর বিপরীতে যেমন মন্দ, তেমনি ইন্টারনেট নামক বিশ্বজয়ী যন্ত্রটির সাথেও রয়েছে অপকার নামক শব্দটি। ইন্টারনেটের বিরাট সুফলের পাশাপাশি রয়েছে এর কুফলও। কারণ ইন্টারনেটের নিষিদ্ধ জগতের অশ্লীলতা ও নগ্নতা আমাদের সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে অবক্ষয়ের অতল গহ্বরে ধাবিত করছে। এর ফলে ছাত্রসহ যুব সমাজের মূল্যবোধে অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। কেউ কেউ ইন্টারনেটে ভাইরাস দিয়ে বহু কম্পিউটারের ক্ষতি করছে। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ইচ্ছাকৃতভাবে কিউ 'ইন্টারনেট ওয়ার্ম' নামক ভাইরাস ঢোকায়। ফলে বহু কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যায়। অন্য একটি ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন তের বছর বয়সী স্কুল ছাত্র তাদের স্কুলে বোমা রেখে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। দু' একটা নয়, এমন বহু উদাহরণ আছে। প্রকৃত বিচারে ইন্টারনেটের কোন অপকারিতা নেই। ইন্টারনেটের ব্যবহারকারীর অসৎ উদ্দেশ্যের মধ্যেই এর অপকারিতা নিহিত। ইন্টারনেটের তথাকথিত অপকারিতার জন্য ইন্টারনেট দায়ী নয়, দায়ী এর ব্যবহারকারী।

ইন্টারনেট আধুনিক প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। ইন্টারনেটের বহুমুখী সুবিধা আজ মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে। জীবনকে করেছে স্বাচ্ছন্দ্যময়, পৃথিবীকে করেছে ছোট থেকে ছোটতর। তাইতো ইন্টারনেট এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জয়মাল্য পরিধান করে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে।

নুরুন নাহার কবিতা
৭৫ নং সুবলদাস রোড
লালবাগ, ঢাকা-১২০৫

স্যার আইজ্যাক নিউটন : মহাকর্ষ বল সূত্রের উদ্ভাবক

এবার আমরা নিউটন সম্পর্কে জানব : মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি কোন অবলম্বন ছাড়াই যে অদৃশ্য মহাশক্তির প্রভাবে মহাশূন্যে ভেসে আছে – সেই মহাকর্ষ সূত্রকে যিনি গণিতিকভাবে প্রকাশ করেন, তিনি হলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। ডিসেম্বর ২৫, ১৬৪২ খ্রিঃ তারিখে ইংল্যাণ্ডের এক গ্রাম্য খামার বাড়ীতে আইজ্যাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নামও ছিল আইজ্যাক নিউটন। নিউটনের জন্মের আগে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। এজন্য তাঁর মা হান্না নিউটন তাঁর স্বামীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজ সন্তানের নামও রাখলেন স্বামীর নামানুসারে। কিন্তু মাত্র দুই বছরের মাথায় নিউটনের মা এক গীর্জার যাজকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিয়ের আগে তিনি তাঁর সমুদয় সম্পত্তি পুত্র নিউটনের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে যান।

এরপর নিউটন তাঁর জন্মস্থান লিঙ্কনশায়ারে উলসথর্প গ্রামে তাঁর দিদিমার তত্ত্বাবধানে লালিত হতে থাকেন। হাতেখড়ির পর বার বছর বয়স অবধি নিউটন উলসথর্প গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনা করেন। তারপর তিনি ভর্তি হন গ্যানথাম শহরের কিংস স্কুলে। গ্রাম থেকে প্রতিদিন তাকে পায়ে হেটে শহরে গিয়ে স্কুল করতে হতো।

স্যার আইজ্যাক নিউটন

স্কুল জীবনে তিনি কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। পড়াশুনায় বরাবর কাঁচা ছিলেন বলে শিক্ষকরা তাকে তিরস্কার করতো। এই ব্যাপারে সহপাঠিরাও তাঁর সাথে ঠাট্টা করতো। যাহোক তাঁর স্কুলে যাতায়াতের কষ্ট দেখে মা হান্না শহরে তাঁর এক বান্ধবীর বাসায় নিউটনের লজিং থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু পড়াশুনার চেয়ে তাঁর ঝোঁক ছিল নিজ হাতে সূর্যঘড়ি, জলঘড়ি ইত্যাদি বানানোর দিকে। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন একটু ভাবুক প্রকৃতির। নির্জন একাকী বসে চিন্তা করতে বেশি পছন্দ করতেন। এমনকি স্কুলে বসেও সহপাঠীদের সাথে তিনি তেমন একটা মেলামেশা করতেন না। স্কুলে পড়াশুনায় তেমন ভালো করতে না পারলেও তিনি গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র বেশ আগ্রহ নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। বই পড়ার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরী করতেন এবং ছোট-খাটো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতেন। তাছাড়া তিনি ভালবাসতেন ছবি আঁকতে।

নিউটনের যখন ১৫ বছর বয়স তখন তাঁর মায়ের দ্বিতীয় স্বামী মারা যান। এ সময়ে তাঁর মা দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর কাছে চলে আসেন। ছেলের কাছে ফিরে আসার পর ছেলের পড়াশুনার অবস্থা দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন বাবার মত ছেলেও হয়ত চাষী হবেন। তাই তিনি নিউটনকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে চাষাবাদের কাজে লাগিয়ে দিলেন। সাপ্তাহিক হাটে নিউটনকে ক্ষেতের উৎপাদিত সব্জি বিক্রি করতে হতো। কিন্তু এ কাজও নিউটন বেশিদিন করলেন না। প্রায়ই হাটে না গিয়ে ঝোপে বসে তিনি বিজ্ঞানের বই পড়তে লাগলেন। এ অবস্থায় তাঁর মা পড়লেন মহা বিপাকে এ রকম একটা অপদার্থ ছেলেকে নিয়ে। নিউটনের কাকার সাথে তাঁর মা অনেক পরামর্শ করে বুঝতে পারলেন যে, এই ছেলেকে দিয়ে চাষাবাদ সম্ভব নয়। তাই ১৬৬০ সালে তাঁকে আবার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো।

তিনি ছিলেন খ্যাপাটে স্বভাবের : হয়তো শৈশবে মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলেই তাঁর একধরণের মানসিক বৈকল্য ঘটেছিল। এই খ্যাপাটে স্বভাবের জন্য একবার এক সহপাঠীকে মারধর করে নাক মুখ ফাটিয়ে দিলেন। এই একটি ঘটনাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। প্রচণ্ড অনুশোচনায় ভেবে দেখলেন যে, ছেলেটিকে তিনি গায়ের জোরে হারিয়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু লেখাপড়ায় তার ধারে-কাছেও

খেয়তে পারবেন না। প্রচণ্ড জেদ চেপে গেল নিউটনের, যেভাবেই হোক পড়াশোনায়ও তাকে হারাতে হবে গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি পড়াশোনা করতে লাগলেন। বছর খানেকের মধ্যে তিনি লাস্ট থেকে ফার্স্ট বয় হয়ে গেলেন। এমনকি স্কুলের সবচেয়ে সেরা ছাত্রের থেকেও বেশি নম্বর পেলেন।

স্কুলের পড়া শেষ করে আঠারো বছর বয়সে তিনি ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। কলেজে গিয়ে তিনি গণিতে অসাধারণ মেধার পরিচয় দিলেন। প্রথম বছরেই তিনি গণিতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন ক্যালকুলাস আবিষ্কার করে। যা বর্তমানে কলেজ লেভেলে পড়ানো হয়। চাঁদের চারিদিকে মাঝে মাঝে 'চাঁদের সভা' দেখা যায়। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকা জলীয় কণার উপর আলো পড়ে সৃষ্টি হয় চাঁদের সভা (চাঁদের চারিদিকে চাকতির মত আলোক প্রভা)।

তেইশ বছর বয়সে তিনি কলেজের পড়াশুনা শেষ করার পর গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু পরের বছর সারা দেশে প্লেগ মহামারি আকারে দেখা দেয়। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে নিউটন তাঁর গ্রামে ফিরে এসে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এ সময় বৈজ্ঞানিক সব সমস্যা গণিতের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করতে থাকেন। গ্রামে থাকাকালীন সময়ে ২৫ বছর বয়সে পদার্পন করার আগেই তিনি তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের ভিত দাঁড় করালেন।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হয়ে নিউটন সবাইকে অবাক করে দেন। এরপর শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। এতে দেশের শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি ঘটে।

১৬৭২ সালে আলোক বিজ্ঞানের উপর তাঁর সর্বপ্রথম গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। এ সময়ই তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

১৬৮৪ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যাডমণ্ড হ্যালির অনুপ্রেরণায় রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থ *Philosophiae Naturalis Principia Mathematcia.* প্রিন্সিপিয়া নামে সমধিক খ্যাত ল্যাটিন ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটি ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার উপর ভিত্তি করে তিন খণ্ডে এই গ্রন্থটি রচিত। ১৬৯৬ সালে তিনি সরকারী টাকশালের ওয়ার্ডেন নিযুক্ত হন। ১৭০৩ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির পদ অলংকৃত করেন।

গ্রহসমূহ কি করে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন মহাকর্ষ বল তত্ত্বের। কথিত আছে গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ার কারণ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়েই তিনি মধ্যাকর্ষণ তথা মহাকর্ষ বল সংক্রান্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। অন্যান্য জ্যোতির্বিদরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব দিয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি হিসাব সম্ভব হচ্ছে। আলোক বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর অসম্ভব ঝোঁক। তিনি সর্বপ্রথম প্রিজম ব্যবহার করে আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করেন। তিনি আলোর গঠন শৈলী নিয়েও গবেষণা করেন। দূরবীনের মধ্য দিয়ে আলোর গতিবিধি তিনি গণিতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তিনি দূরবীনেরও প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি নতুন এক ধরণের দূরবীন তৈরী করেন যেখানে অবজেকটিভ হিসেবে লেন্সের বদলে প্রতিফলক অবতল দর্পন ব্যবহার করেন। তাঁর তৈরী প্রথম দূরবীনের ব্যাস ছিল মাত্র এক ইঞ্চি এবং লম্বায় দুই ইঞ্চি। কিন্তু এই দূরবীনের মাধ্যমে দূরের লক্ষ্যবস্তু চল্লিশ গুণ বর্ধিত আকারে দেখা যেত। তাঁর আবিষ্কৃত এই দূরবীন নিউটোনিয়ান রিফ্লেক্টর হিসেবে পরিচিতি ও বহুল ব্যবহৃত। তাঁর প্রধান আবিষ্কারগুলো হলো – মহাকর্ষ অভিকর্ষ বলের সূত্র, গতির সূত্র, ইন্টিগ্রাল ও ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, শীতলীকরণ সূত্র ইত্যাদি।

নিউটন ছিলেন খুবই সাদাসিধে ও আত্মভোলা প্রকৃতির লোক। তবে গবেষণায় তাঁর ছিল আশ্চর্যরকম নিষ্ঠা ও ধৈর্য। তাঁর পোষা কুকুর একবার বাতিদান উল্টে ফেলে টেবিলে রাখা তাঁর কয়েক বছরের পরিশ্রম সাপেক্ষে ক্যালকুলাসের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু তিনি এতটুকু বিচলিত না হয়ে আবার কঠোর

পরিশ্রম করে কয়েক বছরের চেষ্টায় আবার পুড়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু সম্বলিত নতুন পাণ্ডুলিপি রচনা করেন।

মহান বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন ছিলেন চিরকুমার। এ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি একটি মেয়েকে ভালবাসতেন এবং মেয়েটিও তাঁকে ভালবাসতো। একদিন বাগদান করার জন্য গেলেন সেই মেয়েটির কাছে। তারপর রীতি অনুযায়ী হাত টেনে নিলেন প্রথামত বাগদত্তার হাতে আংটি পরানোর জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে উদয় হল বিজ্ঞানের একটি জটিল সমস্যার। তিনি মগ্ন হলেন গভীর চিন্তায়। তিনি ভুলে গেলেন তার পারিপার্শ্বিকতা। আর একটা অভ্যাস ছিল তাঁর-গভীর চিন্তায় ডুবে গেলে তিনি ধূমপান করতেন। সে মুহূর্তে তিনি অন্যমনস্কভাবে মেয়েটির আঙ্গুল মুখে পুরে সিগারেট মনে করে অগ্নিসংযোগ করলেন। এ কারণেই তাঁর আর বিয়ে করা হয় নি।

আর একবার তাঁর বাড়ীতে এক বন্ধুকে আমন্ত্রণ করেছিলেন খাওয়ার জন্য। যথাসময়ে বন্ধুটি এসে দেখেন যে, নিউটন ল্যাবরেটরীতে গবেষণায় ব্যস্ত। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর বন্ধুটি টেবিলে রাখা আস্তা মুরগিটি খেয়ে শুধু হাড়গোড় প্লেটে রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ পর নিউটন এসে টেবিলে মুরগির হাড়গোড় দেখে বললেন - আমি মনে করেছি এখনো রাতের খাবার খাইনি। এখন দেখছি আগেই আমি খাবার খেয়ে গেছি। এই বলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন বন্ধুকে ফেলে খাওয়ার জন্য। এরকম আত্মভোলা তিনি ছিলেন। তিনি নিজেকে কখনো বড় মনে করতেন না। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন - "লোকজন আমাকে কি ভাবে আমি তা জানি না। কিন্তু নিজের কাছে মনে হয় বিশাল জ্ঞান সমুদ্রের বালুকাবেলায় ছোট্ট শিশুর মত শুধুই ঝিনুক কুড়াচ্ছি এবং বিশাল জ্ঞানের সমুদ্র আমার কাছে অজানাই পরে রইল"।

মার্চ ২০, ১৭২৭ তারিখে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে সমাহিত করা হয়।

যেখান থেকে সঙ্কলিত হয়েছে ঃ

- জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা - সুজন কুমার দেব।
- ওয়ার্ল্ড ফেমাস সাইন্টিস্ট
- গুগল সার্স - নিউটন

মো: নাসিম
একাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান)
সরকারী সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ
গ্রাম-মুগাকাঠী, পোঃ ধামসর-৮২২৪
উজিরপুর, বরিশাল

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

মিউজিয়াম অর্থ জাদুঘর। জাদু শব্দটি ফার্সী, এর অর্থ ইন্দ্রজাল, মায়া, কুহক বা ভেলকি। বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধানে জাদুঘর শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে : 'যেখানে পুরাতত্ত্ব বিষয়ক ও অন্যান্য বহুপ্রকার অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক প্রাকৃতিক ও শিল্প বিজ্ঞানজাত বস্তু সংরক্ষিত থাকে'। জাদুঘর মায়ার ঘর অর্থাৎ যে ঘরে কৌতুকজনক দ্রব্যসমূহ দেখে দর্শক মুগ্ধ হয় (বঙ্গীয় শব্দ কোষ)।

জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে প্রাক শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন প্রয়োজন হয় না। এখান থেকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষণা কাজে নিয়োজত ব্যক্তিগণ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকেন। কোন দেশের জাদুঘর পরিদর্শন করলে সে দেশের কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

তবে জাদুঘর এখন শুধু প্রত্নিদর্শন সংগ্রহশালয় সীমিত না থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক নানা নিদর্শন-প্রদর্শনেরও আধার হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞান বিষয়ক বস্তু নিদর্শন আগ্রহ সৃষ্টি করেছে সাধারণ সকল মানুষের মধ্যে।

কোন জাতির বা দেশের অতীতের বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, সংস্কৃতিগত মানুষের জীবন ধারা সম্বন্ধে প্রদর্শনীবস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে দর্শকদের জ্ঞান দিতে পারে জাদুঘর। অতীত কীর্তি সম্ভারকে সংরক্ষণ করে দর্শকদের অতীত আর বর্তমানের মধ্যে সৃষ্টি করেছে সেতু বন্ধন। জাদুঘরের সংগৃহীত ও সংরক্ষিত প্রদর্শনীবস্তুগুলো দর্শকদের প্রদর্শনের মাধ্যমে আনন্দ, বিনোদন, শিক্ষা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা, অগ্রগতি ও গবেষণামূলক কাজ ত্বরান্বিত করতে পারে।

সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক জাদুঘর দেখা যায়। বিষয়গত জাদুঘরও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন - বিজ্ঞানভিত্তিক জাদুঘর, প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, লোক সংস্কৃতি জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর, রক্সভিত্তিক জাদুঘর, সমুদ্র সম্পদভিত্তিক জাদুঘর, জাতিগত জাদুঘর, ডাক জাদুঘর, রেলওয়ে জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় জাদুঘর, শিশু জাদুঘর, স্মৃতি জাদুঘর, এলাকাভিত্তিক জাদুঘর, শিল্পকলা বিষয়ক জাদুঘর, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঐতিহাসিক জাদুঘর, উদ্ভিদ বিষয়ক জাদুঘর, মৎস্য জাদুঘর, মেডিক্যাল বিষয়ক জাদুঘর, সামরিক জাদুঘর ইত্যাদি।

ষাটের দশকে আমেরিকার সানফ্রান্সসিসকো শহরে পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক জাদুঘর গড়ে তোলেন বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেন হেইমার-এর ভাই মি. ফেন্স। এর লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞানের শিক্ষাকে মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেয়া। মানুষকে বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠন করা। এ ধারাকে অব্যাহত রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তৎকালীন সরকার ১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল ঢাকায় এবং লাহোরে একটি করে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে আমাদের দেশে বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রাথমিক কাজ শুরু হয় ১৯৬৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাবলিক লাইব্রেরিতে। সে সময়ে এ জাদুঘরের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ঢাকা জাদুঘর। ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল শ্যামলীতে স্থানান্তর হয় জাদুঘরটি। দ্বিতীয়বার স্থানান্তর হয় ১৯৭১ সালের ১৬ মে ধানমণ্ডির ১ নং সড়কে। তৃতীয়বার ১৯৭৭ সালের ১ আগস্ট ধানমণ্ডির ৬নং সড়কে, চতুর্থবার ১৯৮২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কাকরাইলে। পর্যায়ক্রমে ১৯৮৭ সালের ১ নভেম্বর শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁওয়ের নিজস্ব ভবনে স্থায়ী রূপ লাভ করে। এটাই দেশের প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ জাদুঘর। এ জাদুঘরের ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারী, জীব বিজ্ঞান গ্যালারী, শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারী, আইটি গ্যালারী, মজার বিজ্ঞান গ্যালারী, মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারী, চিলড্রেন গ্যালারী ও তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত মান উন্নীত প্রকল্পের গ্যালারীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানা নিদর্শন

উপস্থাপিত হচ্ছে। সপ্তাহে ৫ দিন (শনি থেকে বুধ) গ্যালারীসমূহ দর্শকদের জন্য খোলা থাকে। শহরের কোলাহল থেকে বেশ দূরে হলেও প্রতিমাসে কয়েক হাজার দর্শক এ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

এ জাদুঘর দেশের আপামর জনগণকে বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহ প্রদান, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে নানারূপ কর্মসূচি গ্রহণ করে। শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জাদুঘরের নিজস্ব গাড়িতে করে শিক্ষার্থীদের এনে জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতি শনি ও রবিবার আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে টেলিস্কোপের সাহায্যে আগ্রহী দর্শকদের জন্য আকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৭৪টি কেন্দ্রে প্রতিবছর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ পালন করা হয়। সেখান থেকে শ্রেষ্ঠ নবীন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় প্রদর্শন করা হয়। তাছাড়া, তরুণ ও অপেশাদার বিজ্ঞানীদের প্রকল্পের মান উন্নয়নে জাদুঘর বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ছোটদের জন্য ত্রৈমাসিক 'নবীন বিজ্ঞানী' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবকে সাধ্যমত সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

জনগণকে বিজ্ঞান শিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য জাদুঘরের মুক্তাঙ্গণে একটি 'সায়েন্স পার্ক' স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও জাদুঘরে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর (মিউজু বাস) সাহায্যে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। দর্শকরা এখানে এসে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক হাতে-কলমে শিখতে পারছে। একমাত্র এখানেই 'Dont Touch' হাত দেয়া যাবে না এ ধরনের সীমাবদ্ধতা বা বিধি-নিষেধ নেই।

মো: মিজানুর রহমান
সিনিয়র আর্টিস্ট-কাম-অডিও ভিস্যুয়াল অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
ঢাকা

"প্রযুক্তি করিতে পারে দারিদ্র মোচন"

৩৬তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা

২৮-৩০ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ঢাকা বিভাগ ঃ

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম
১।	ঢাকা	জুনিয়র	বিকল্প জ্বালানীরূপে হাইড্রোজেন	ফাতীন আনাম রাফিদ ও ফারহান সামিন প্রিয়ন্ত
		সিনিয়র	ডিজিটাল ইন্সটিটিউট	তানজিম হাসান ফাহিম ও মোঃ হারিস হোসেন
		বিশেষ	দাঁতের উপর কোমলপানীয়র প্রভাব	মোঃ সোলায়মান হোসেন ও সুরাইয়া তাসনীম
২।	মুন্সিগঞ্জ	জুনিয়র	ওয়াটার ক্যান্ডেল	মেহেবুবা আফরোজ ঐশী
		সিনিয়র	রিডিউস লঞ্চ সিংক	মোঃ রাকিব হোসেন
৩।	মানিকগঞ্জ	জুনিয়র	বৈদ্যুতিক লঞ্চ ও লঞ্চ ডুবি রোধ	কাজিম ফাহিম আকাশ, কিশোমাহ আনজুম সামা, সামিউল আলম পার্থ ও ইশতিয়াক রহমান ভূইয়া
		সিনিয়র	লেজার সিকিউরিটি এ্যালার্ম	শামীম হোসেন, মোঃ মাসুদুর রহমান ও মোঃ আমিনুল ইসলাম
		বিশেষ	এ্যান্ড্রয়েড এ্যাপস	মোঃ শফিকুল ইসলাম
৪।	নরসিংদী	জুনিয়র	পেট্রোল বোমা নিরোধক বাস	অভিশেখ সাহা ও সৌরভ হোসেন
		সিনিয়র	ওয়াটার এয়ার কুলার	আব্দুর রাজ্জাক ও দিলরুবা সাহা লুবনা
৫।	ময়মনসিংহ	জুনিয়র (জীব)	দ্রুত ফুল ফোটানোর যন্ত্র	ফারহা বিনতে আজহার
		জুনিয়র (ভৌত)	এসিড বৃষ্টির প্রতিকার ও এসিড বৃষ্টির উপাদান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন	মোহাইমিনুল ইসলাম রিফাত
		সিনিয়র (জীব)	সমন্বিত পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা	সৌরভ চন্দ্র সরকার ও তরিকুল ইসলাম
		সিনিয়র (ভৌত)	কলার ছোবরা থেকে প্লাস্টিক	তাহমিনা ইনতেশার
		বিশেষ	ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডাইসেপারেশন	হাসিবুল বান্না রিয়াদ
৬	কিশোরগঞ্জ	জুনিয়র	প্রাকৃতিক উপায়ে কম খরচে টয়লেট ক্লিনার প্রস্তুত	সাইফুল ইসলাম আবিদ
		সিনিয়র	বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনারোধে আগাম সংকেত নির্ণয়	মোঃ নাজমুল সাকিব
		বিশেষ	ফিল্টার বালু ও বালু ফ্যাক্টরী প্রকল্প	মোবারক হোসেন
৭।	নেত্রকোনা	জুনিয়র	সৌরশক্তি চালিত হিটার	হাবিবা খানম সাদিয়া
		সিনিয়র	অটো সিগনালের মাধ্যমে ট্রেনের অবস্থান নির্ণয়	মোঃ নিজাম উদ্দিন
৮	টাঙ্গাইল	জুনিয়র	যানজট নিরসনে ইউটার্ন	শারমিন জান্নাত তামান্না
		সিনিয়র	ম্যাগনেটিক ফ্যাক্স সেন্সর	মোঃ আল-আমিন
		বিশেষ	নিরাপদ ফসল উৎপাদনে জৈব বালাই নাশকের ব্যবহার	মোঃ আনোয়ার হোসেন
৯।	জামালপুর	জুনিয়র	Hover Craft	বোরহান কবির
		সিনিয়র	সুপার সিকিউরিটি কলিং বেল	মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
		বিশেষ	ডিজিটাল কনটেন্ট	মোঃ সায়েম
১০।	শেরপুর	জুনিয়র	সবুজ নগরায়ন শিল্পায়ন	জিনিয়া আক্তার জ্যোতি
		সিনিয়র	পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় জৈব প্রযুক্তি	তমা রানী রায়
১১।	ফরিদপুর	জুনিয়র	দূর্ঘটনা রোধে বিজ্ঞানের ব্যবহার	পৃথা সাহা
		সিনিয়র	সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইড	মোঃ মোরশেদ আলী

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম
১২।	শরীয়তপুর	জুনিয়র	একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাড়ি	অভিষেক সিকদার, আসিফ ইকবাল অপন, অমিত রায়হান ও রিদওয়ান আহমেদ
		সিনিয়র	কম্পিউটার পরিচিতি সফটওয়্যার	মিরাজ হোসেন
		বিশেষ	দূর নিয়ন্ত্রিত বিপদ সঙ্কেত	জি.এম কামরুজ্জামান ও শুভ্র দত্ত
১৩।	মাদারীপুর	জুনিয়র	সিকিউরিটি সিস্টেম ফর মডার্ন হাউস এন্ড ব্যাঙ্ক	দিব্য দাস স্বাধীন
		সিনিয়র	সহজ উপায়ে তেজস্ক্রিয় উদ্ভিদের ব্যবহার	মনিরুজ্জামান
১৪	গোপালগঞ্জ	জুনিয়র	স্পিড ব্রেকার	আকিব হাসান
		সিনিয়র	ওয়াটার লেবেল ডিটেক্টর	মোঃ মতিউর রহমান
		বিশেষ	পরিত্যক্ত জিনিসের ব্যবহার	মোঃ রফিকুল ইসলাম
১৫	রাজবাড়ী	জুনিয়র	কেরোসিন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন	রিয়াসাত ইবনে রইস (সামিট)
		সিনিয়র	Solar System Amplifing	মিনহাজউর রহমান

চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ

১৬।	চট্টগ্রাম	জুনিয়র	Drip Irrigation System	আদিল আহনাফ
		সিনিয়র	Senson Base Far in Incubator	প্রনোদন পুতুল
		বিশেষ	Android Base Low Cost ECG Machine	মোঃ আবদুল্লাহ আল নোমান
১৭।	রাঙ্গামাটি	জুনিয়র	Aqua Robot	আয়মান উদ্দিন
		সিনিয়র	শৌচাগারের বর্জ্য থেকে বহুমুখী উৎপাদন	এহসানুল মাহবুব জোবায়ের
১৮	বান্দরবন	জুনিয়র	বায়ুমণ্ডল রক্ষা কর, বাংলাদেশ বাঁচাও, পৃথিবী বাঁচাও	সুলতানুল আরেফিন বায়েজিদ
		সিনিয়র	অটো ডিটেক্টর	ভুবন দে
		বিশেষ	প্রস্তাবিত নীলাচল হতে বান্দরবানের সকল পর্যটন স্পটসমূহ দেখার সহজ উপায়	জান্নাতুল ফেরদৌস এমি
১৯।	কক্সবাজার	জুনিয়র	A Dry Air Cooler	রোমেনা নাইম ও খাদিজা তানিম নিশু
		সিনিয়র	পরিকল্পিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	রোকাইয়া, সাদিয়া মুনতাহা, উম্মে শিফা ও তাজিরিয়ান বিনতে লিয়াকত
		বিশেষ	রিমোট কন্ট্রোলের সহায়ে বৈদ্যুতিক সুইচের কর্যাবলী নিয়ন্ত্রণ	ইসমাঈল হক, ধ্রুবন ইদরার, নাঈমুল হাসান, তাশরীফ উর রেজা ও নাওয়াল ফায়েজ
২০।	কুমিল্লা	জুনিয়র	সৌর পাম্প	আনাম জাহিদ হোসেন
		সিনিয়র	রসায়ন ও জাদু	রাতুল বিশ্বাস
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	জুনিয়র	রেল লাইন নাশকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ	গাজী মোহাম্মদ ইশতিয়াক
		সিনিয়র	মোবাইল সিস্টেম সিকিউরিটি	আব্দুল্লাহ আল-মামুন
		বিশেষ	Super Intensive Fish Culture Technology	মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
২২।	চাঁদপুর	জুনিয়র	বিনা জ্বালানীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন	দীপ্ত শিকদার
		সিনিয়র	জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল	নাসরিন আক্তার
		বিশেষ	ফ্লুইং ম্যান	মোঃ মোস্তফা কামাল
২৩।	নোয়াখালী	জুনিয়র	আধুনিক ড্রোনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ	ইয়াছির আরাফাত প্রিতম
		সিনিয়র	Implimentation Electrocardigram (ECG) Machine	রেহনুমা তাবাসুম
২৪।	লক্ষীপুর	জুনিয়র	রোবট	শেখ মাহির আল জাবের

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম
		সিনিয়র	Water Alarming System এর সাহায্যে বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় রোধ	শাহ নেওয়াজ আলম
২৫	ফেনী	জুনিয়র	Calling Power Controller	আবিদুল মাওলা খান
		সিনিয়র	স্বল্প মূল্যে গৃহ নির্মিত আই.পি.এস	নাজনীন সুলতানা

রাজশাহী বিভাগ ঃ

২৬।	রাজশাহী	জুনিয়র	লো-কস্ট সোলার প্যানেল	সৈয়দ রায়হান আহমেদ অনিক
		সিনিয়র	কোয়াড ড্রোন আর.সি-৪	মোঃ তৌহিদুর রহমান
২৭।	নাটোর	জুনিয়র	টেলি প্রেজেন্স রোবোট	সাফিক আনাম জোয়াদ্দার
		সিনিয়র	অটো রেল বেরিকেড এ্যাট লেভেল ক্রসিং	মোঃ শাহরিয়ার পারভেজ
২৮	নওগাঁ	জুনিয়র	স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা	লামিয়া হাসান
		সিনিয়র	ট্রেন দূর্ঘটনা প্রতিরোধের আধুনিক প্রযুক্তি	নিলয় কুমার মন্ডল
২৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জুনিয়র	জাহাজের দূর্ঘটনা এড়ানোর প্রযুক্তি	তাসবিরুল আলম
		সিনিয়র	ফরমালিন সনাক্তকরণ পদ্ধতি	মু. রবিউল ইসলাম
		বিশেষ	ওয়্যারলেস ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম	মোঃ নাসিম হায়দার
৩০।	পাবনা	জুনিয়র	হিউম্যান বডি সেন্সর	হাসান মাহমুদ
		বিশেষ	পেট্রোল বোমা বিরোধ বাস	এস.এম শিহাবুদ্দিন চিশতি
৩১	সিরাজগঞ্জ	জুনিয়র	লঞ্চ প্রটেক্টর	ফারহান মোহাম্মাদ হাসান
		সিনিয়র	ওয়াটার বেজড এয়ার পলুটেশন কন্ট্রোল ইউনিট	এস.এম তৌহিদ ইসলাম
		বিশেষ	বায়ো প্লাস্টিক	ফরিদুল হাসান
৩২	বগুড়া	জুনিয়র	Smart Road Environment	মোঃ মাসরুরুল হাসান
		সিনিয়র	স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	মোঃ রবিউল হাসান
		বিশেষ	লেজার স্পাইরোগ্রাম	মোঃ ইনজামাম-উল-আলম
৩৩।	জয়পুরহাট	জুনিয়র	পেট্রোল বোমা প্রতিরোধকারী যন্ত্র	মোঃ নাফিজ আল-মাহমুদ উৎসব
		সিনিয়র	মাইক্রোওয়েভ অবলোহীত তরঙ্গের দ্বারা ভূমিকম্প সতর্কীকরণ	সব্যসাচী মহন্ত সবুজ
		বিশেষ	Urine Alert	শ্রাবণ মন্ডল

খুলনা বিভাগ ঃ

৩৪।	খুলনা	জুনিয়র	মানব কল্যাণে কার্বন-মনো-অক্সাইড গ্যাস	মোঃ মুহাইমিনুল ইসলাম (জামী)
		সিনিয়র	অটোমেটিক ওয়াটার ট্যাংক লেভেল কন্ট্রোলার	মোঃ মাহমুদুর রহমান
		বিশেষ	মিনি প্রজেক্টর	এস এম মাসুদ রানা
৩৫।	বাগেরহাট	জুনিয়র	ভেষজ উপকরণ দিয়ে গাস্ট্রিক ও ডায়াবেটিকস এর ঔষদ উদ্ভাবন	শামস শাহরিয়ার রাফিদ
		সিনিয়র	সাইকেল চালিয়ে মোবাইল চার্জ	আলিমুন শরীফ
		বিশেষ	ফরমালিন রিমুভার	সায়মন জিয়ন
৩৬	সাতক্ষীরা	জুনিয়র	সৌর চলিত ট্রেন	মাহবুবুর রহমান
		সিনিয়র	অটোমেটিক হোম সিকিউরিটি	একরামুল খান
		বিশেষ	নন টাচ টেস্টার	মনিরুজ্জামান
৩৭	যশোর	জুনিয়র	উন্নত প্রযুক্তির বায়োগ্যাস প্লান্ট	আব্দুর রহমান
		সিনিয়র	ইট ভাটার ধোয়াকে বিশুদ্ধকরণ	লিখন আহমেদ ও মোঃ সাফায়েত
		বিশেষ	আধুনিক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র	মিজানুর রহমান

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম
৩৮।	ঝিনাইদহ	জুনিয়র	প্রোডাক্ট অব ম্যানুয়াল এনার্জি	সবুর আহমেদ কাজল
		সিনিয়র	Water Level Indicator	মোঃ নাঈম
		বিশেষ	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন	এস এম শাহীন হোসেন
৩৯।	মাগুরা	জুনিয়র	-	তরিকুল ইসলাম
		সিনিয়র	-	ইমরোজ ইসলাম
		বিশেষ	-	মোঃ নাগিব মাহফুজ
৪০	নড়াইল	জুনিয়র	হোম অটোমেশন	রনন বিশ্বাস
		সিনিয়র	দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদন	শাহাবুদ্দিন ও নাহিদুজ্জামান
		বিশেষ	স্বল্প খরচে প্রজেক্টর ও রিমোট চালিত ফ্যান	রুবেল
৪১	কুষ্টিয়া	জুনিয়র	সিটি ফার্ম	তাহসিন রাইসা
		সিনিয়র	পানির প্ল্যান্টের বর্জ্য থেকে মূল্যবান রাসায়নিক হিরাক্ষ নিষ্কাশন	রাকিব রহমান
		বিশেষ	শিল্পবর্জ্য পানি টিকলিং ফিল্টার পদ্ধতিতে পরিশোধন ও পুনরায় ব্যবহার	নাহিদা আক্তারী খানম
৪২।	চুয়াডাঙ্গা	জুনিয়র	আধুনিক মাথাভাঙ্গা ব্রিজ	মোঃ হাসানুজ্জামান ও আশিকুজ্জামান
		সিনিয়র	Uuder Ground Security	মোঃ মনিরুজ্জামান ও আরিফ ইশতেয়াক ইসলাম
		বিশেষ	Automatic Security Lock (মোটরসাইকেল)	মোঃ আব্দুস সামাদ, মোঃ শিপন হোসেন ও মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
		বিশেষ	পাতা থেকে কাঠ তৈরি	প্রকৌ: মোঃ টিপু সুলতান
৪৩।	মেহেরপুর	জুনিয়র	ব্যক্তিগত ডেটা সিকিউরিটি	আব্দুল্লাহ কাওসার তন্ময়
		সিনিয়র	পেট্রোল বোমা থেকে যানবাহন রক্ষা	হুমাইন জান্নাত
		বিশেষ	কক্ষ শীতল রাখা যন্ত্র	জহিরুল ইসলাম

সিলেট বিভাগ ঃ

৪৪।	সিলেট	জুনিয়র	Digital and Safe Communication Way	অনিক চৌধুরী
		সিনিয়র	Railway Safety Plan	তাহিয়ান ফারহান
		বিশেষ	সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প	আব্দুল হাই বাবলা
৪৫।	মৌলভীবাজার	জুনিয়র	উইপোকা মুক্ত নির্মাণ কৌশল	নিশাত তাসনিম আহমেদ শাওলীন
		সিনিয়র	শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি'র প্রয়োগ	নয়ন দেব
৪৬।	হবিগঞ্জ	জুনিয়র	Quad Copter (Drone)	টি.এন. আল আনাম গং
		সিনিয়র	Voice Controle House	সাইফুর রহমান
		বিশেষ	সার্চ প্রটেক্টর	শুভম চক্রবর্তী
৪৭	সুনামগঞ্জ	জুনিয়র	হাতের সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরি	কিংশুক গোস্বামী ও চয়ন দত্ত
		সিনিয়র	রেলক্রসিং-এ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা	জয়ন্তপাল

বরিশাল বিভাগ ঃ

৪৮।	বরিশাল	জুনিয়র	মোবাইলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালু ও বন্ধ করা	মুহতামিম হক তাওহীদ
		সিনিয়র	ফোনোগ্রাফিক কনসুমার রোবট	মোঃ আইদিদ আলম
৪৯।	পটুয়াখালী	জুনিয়র	বাঁশের তৈরি গ্রামীন ফাস্ক	অপি
		সিনিয়র	ইউনিভার্সাল চার্জার	মোঃ আঃ কাইয়ুম
৫০।	ঝালকাঠি	জুনিয়র	পানির অপচয়রোধক ট্যাঙ্ক	সুদীপ্ত বরণ কর্মকার
		সিনিয়র	$Y\text{-}X^2$ Grafturn ব্যবহার করে যানজট নিয়ন্ত্রণ	ফারিয়া তুলা

ক্রমিক	জেলার নাম	গ্রুপ	প্রকল্পের নাম	প্রতিযোগীর নাম
		বিশেষ	পরিত্যক্ত সিগারেট, চায়ের ফিকার এবং স্যালাইনের পাইপ থেকে বিদ্যুৎ তৈরি	আশীষ স্বর্ণকার, কাবেরী সেনগুপ্তা (স্বর্না) ও রিংকু দাস
৫১।	ভোলা	জুনিয়র	বন্যার সতর্ককরণ	হুসানাইন আহমেদ
		সিনিয়র	নেটওয়ার্কের গতি বাড়ানো	ফাওয়াজ আহমেদ
		বিশেষ	সোলার এন্ড আলট্রাভায়োলেট রশ্মিতে পানি বিশুদ্ধকরণ	সৌরভ গাঙ্গুলী
৫২।	বরগুনা	জুনিয়র	নৌযান ভিত্তিক সতর্কতা	মোঃ শাহনেওয়াজ কবির
		সিনিয়র	সেতুর নিরাপত্তা	মোঃ জাহিদুল ইসলাম
		বিশেষ	স্বয়ংক্রিয় পানির ট্যাঙ্ক	মোঃ রাজ
৫৩।	পিরোজপুর	জুনিয়র	Ideal Hotel in Coastal Area	দীপ সমাদ্দার
		সিনিয়র	আলোর প্রতিফলন	পলাশ মিস্ত্রী
		বিশেষ	বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র	উত্তম চৌধুরী
রংপুর বিভাগ ঃ				
৫৪।	রংপুর	জুনিয়র	হোম এপ্লিয়েন্স কন্ট্রোল সিস্টেম	মোঃ রাইসুল ইসলাম
		সিনিয়র	ভূমিকম্প এ্যালার্ট	হাসান মেহেদী, মাসুমা আক্তার হিমু, ওয়াহিদা আক্তার মিতু ও ফারজানা ফাইজা মোহনা
		বিশেষ	স্বল্প খরচে উন্নতমানের অম্ল ও ক্ষারক নির্দেশক (লিটমাস পেপার) তৈরি	মাহিব ইসলাম মুগ্ধ
৫৫।	কুড়িগ্রাম	সিনিয়র	লাইন ফলোয়ার এবং সামনে বাঁধা শনাক্তকারী রোবট	মোঃ আকতার আহসান
		বিশেষ	ব্যারোমিটার (বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্র)	মোঃ সাইফুল ইসলাম
৫৬।	লালমনিরহাট	জুনিয়র	ডিজিটাল হোম	মোঃ ইব্রাহিম রাশেদ
		সিনিয়র	রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ	মোঃ সোহানুর রহমান সুজাত, মোঃ রবিউল ইসলাম
		বিশেষ	এ্যারোর্ড প্রটেক্টর টাচ সিকিউরিটি সিস্টেম	মাহবুবুল আলম শাকিব
৫৭।	নীলফামারী	জুনিয়র	How to Safe form Petrol Bomb	অলোক দাস
		সিনিয়র	An Eco-Friendly Urea Production	এ.টি.এম শরিফুল আলম
		বিশেষ	অটো ওয়াটার পাম্প সিস্টেম	মোঃ মোনওয়ের হোসেন
৫৮।	গাইবান্ধা	জুনিয়র	পেট্রোলের আগুন দ্রুত নিভানো	মোঃ সাইফুল্লা নাইম
		সিনিয়র	রেল দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পাওয়ার সেফটি সিস্টেম	মোঃ ফাহাদ আকন্দ
		বিশেষ	ডুবে যাওয়া নৌকা উদ্ধার	তামজিদুর রহমান
৫৯।	দিনাজপুর	জুনিয়র	Technology of Third Generation	উৎস সাহা, অভিলাষ রায় ও এএসএম আনাস ফেরদৌস
		সিনিয়র	ধোয়া ও কালিহীন পরিবেশ বান্ধব কয়লা চালিত বিশেষ ধরনের চুলা	মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন
		বিশেষ	New Multiplication Calculating Device	রাসমান মুবতাসিম, সাবিহা নোসিন এশা, মনিষা মমতাজ
৬০।	ঠাকুরগাঁও	জুনিয়র	পেট্রোল বোমা প্রতিরোধ গাড়ী	আদনান সাহীদ অনিক
		সিনিয়র	রোবট	এসএম আফরাদ
		বিশেষ	মাল্টি ডাইমোনশিনাল সিকিউরিটি লাইটিং সিস্টেম	মোঃ সাজেদুর রহমান সাজু
৬১।	পঞ্চগড়	জুনিয়র	ফায়ার হান্টার	সাদমান সাকিব ও রাকিন মুয়িদ মনন
		সিনিয়র	অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা (Fire Entinguisher System)	আসহাব-আল-ইয়ামিন ও কাজী তানিয়া বৃষ্টি
		বিশেষ	সেভ হাউজ ও ফায়ার এলার্ম	আসাদুজ্জামান বাবু ও সাকিব আল-হাসান

বিঃ দ্রঃ সময়মত তালিকা পাওয়া না যাওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতিপয় অংশগ্রহণকারীর নাম মুদ্রণ করা সম্ভব হয়নি।

BANSDOC Dhaka

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন অত্যন্ত আবশ্যক
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকেটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

জাদুঘর গ্যালারী পরিদর্শনের সময়

- শনিবার থেকে বুধবার ঃ সকাল ৯-০০ থেকে বিকাল ৫-০০ (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ)

নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘর গ্যালারী খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- বড় দিন, ২৫ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শনি ও রবিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

উপভোগ করুন স্বল্পদৈর্ঘ্য **4D Movie**

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৯১১৪১২৮